মুজিব
জন্মশতবর্ষ
সংখ্যা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ • সংখ্যা-২২ • বর্ষ-৬

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ • সংখ্যা-২২ • বর্ষ-৬

৬ষ্ঠ বর্ষ শুরু সংখ্যা

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ : **মোস্তাফিজ কারিগর**

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধু : দারিদ্র্য নিরসনে আমাদের অনুপ্রেরণা

অসীম আকাশ তুমি সমুদ্রের অফুরান গান
ভুলিনি তোমাকে আজো শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গোপসাগরের পাললিক অববাহিকায় জন্ম নেয়া এক সাহসী মানুষের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং গভীর আবেগ। এই ভালোবাসা থেকেই তিনি বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় দিনে দিনে অদম্য হয়ে উঠেছেন। বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অপরাজেয় এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। পৃথিবীর ইতিহাসে বিশ্বকে নাড়া দেয়া হাতেগোনা যে ক'জন নেতার আবির্ভাব হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের অন্যতম। বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে যিনি বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান সান্নিধ্যের সুখদ জীবন ছেড়ে বরণ করে নিয়েছেন জেল-জুলুম, দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন 'বন্দুকের গুলিকেও ভয় পাই না, এ দেশের মানুষের জন্যে আমি হাসতে হাসতে মরতে পারি'। এ জন্যই বাংলার মানুষ তাকে ভালোবেসে শেখ মুজিব থেকে বানিয়েছে 'বঙ্গবন্ধু'। যতোদিন বাংলাদেশ, ততোদিন বঙ্গবন্ধু।

বৃটিশ আমলে জন্ম নেয়া এই মানুষটি যৌবনের শুরুতে ইংরেজমুক্ত স্বাধীন উপমহাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত থেকেছেন। ৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জনের পেছনে যে ছাত্রনেতাদের অবদান অনস্বীকার্য তিনি তাদের প্রথম সারির। কিন্তু তারা যে পাকিস্তান চেয়েছিলেন সেই স্বপ্নের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় আবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। গঠন করেছেন নতুন দল আওয়ামী লীগ। এই দলের মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শাসন-শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেছেন তীব্র আন্দোলন। এ জন্য তাঁকে পাকিস্তান আমলের ৪৬৮২ দিন কারা ভোগ করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে কারাবন্দি মুজিবের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চ।

৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে তাঁর দল আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা টালবাহানা শুরু করে। একাত্তরের সাত মার্চ তাঁর উত্থিত তর্জনী থেকে উচ্চারিত হয় 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এ ভাষণ শুধুই কথামালা ছিল না, এ ছিল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া অবধি জ্বলে ওঠা মুক্তির দাবানল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৌর্যবীর্যে দেদীপ্যমান অদম্য সাহসী এক জননায়ক, যিনি আজীবন এই জনপদের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর ঘোষণা ও দিক-নির্দেশনাতেই সংগঠিত হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

বঙ্গবন্ধু প্রতিটি ভাষণে বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তাদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থানসহ দারিদ্র নিরসনের কথা বলেছেন। তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি এই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই শুরু করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব।'

৭৫-এর ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা হারিয়েছি সত্য, কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন হারিয়ে যায়নি। সরকারের পাশাপাশি গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা ও বুরো বাংলাদেশসহ দেশের অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং এমএফআই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনসহ এ সকল সমস্যার সমাধানে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে। নিকট অতীতেও যেখানে দারিদ্র্যের হার ৫০ ভাগের উপরে ছিল তা আজ ২০ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। এই সাফল্যের পেছনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও দরদমাখা বক্তব্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায়। ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত পালিত হবে মুজিব জন্মশতবর্ষ। মহান এই মানুষটির প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা জানাতেই রাষ্ট্রীয়ভাবে মুজিব জন্মশতবর্ষ হিসেবে পালন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারি নির্দেশনার আলোকে বুরো বাংলাদেশ সীমিত আকারে হলেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে নানা কর্মসূচি ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুজিব জন্মশতবর্ষ পালন করছে। বর্ধিত কলেবরে প্রত্যয়ের 'মুজিব জন্মশতবর্ষ সংখ্যা'টি সেই কর্মসূচিরই অংশ। লেখা দিয়ে এ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন দেশের অনেক প্রতিথযশা লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি, প্রত্যয়ের অগ্রযাত্রায় আগামী দিনেও তারা সাথে থাকবেন।

জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাকির হোসেন

শেখ মুজিবুর রহমান একজন স্বপ্নদ্রষ্টা– যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বজাতির স্বাধীনতার। শেখ মুজিবুর রহমান একজন জননায়ক– যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিকামী বাঙালির সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের। শেখ মুজিবুর রহমান একটি জাতির জনক– বিশ্ব সভ্যতায় যিনি এঁকে দিয়ে গেছেন বাংলাদেশ নামক জাতি রাষ্ট্রের মানচিত্র। স্বজাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন যিনি দেখেন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সংগ্রামে যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন, তিনি শুধু তার স্বজাতির নন, হয়ে উঠেন প্রতিটি মুক্তিকামী জাতির নমস্য প্রতিভূ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষেরই প্রতিচ্ছবি।

২০২০ মহান এই ব্যক্তিত্বের সার্থক জন্মের শততম বর্ষ। ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছে 'মুজিব জন্মশতবর্ষ' হিসেবে। রাষ্ট্রের এ উদ্যোগ স্বাধীনতার মহান স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক অনন্য সুযোগ। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের লক্ষে বুরো বাংলাদেশও গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কর্মসূচি। দুখী মানুষের মুখে হাসি শীর্ষক বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রধান কার্যালয়সহ দেশব্যাপী বুরো'র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিলবোর্ড স্থাপন; বিভাগীয়, আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয়ে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন, 'বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি' প্রদান, বিস্তৃত পরিসরে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান, কৃষি খাতে ঋণসেবা বৃদ্ধি, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গ্রন্থক্রয়সহ প্রত্যয়-এর 'মুজিব জন্মশতবর্ষ' বিশেষ সংখ্যাটি সেই কর্মসূচিরই অংশ। বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিতব্য প্রত্যয়ের এই সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখেছেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক। আশাকরি, তাদের এই লেখাগুলো পড়ে পাঠকের সামনে কিছুটা হলেও মূর্ত হয়ে উঠবে একজন সত্যিকারের শেখ মুজিব।

বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন মৃত্তিকার প্রদীপ্ত সন্তান। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা ও লুকায়িত দীর্ঘশ্বাস ঠিকই অনুভব করতে পারতেন তিনি। ফলে এদেশের গরীব-দুখী-বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে লড়াই করে গেছেন আজীবন। জীবনের বিপুল একটা সময় কাটিয়েছেন জেলে, বিসর্জন দিয়েছেন নিজের সুখচিন্তা। তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফাতেও ছিলো বাঙালির অর্থনৈতিক স্বাধিকারের কথা। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর শাসনামলেই ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদ ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য সেবা ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। বুরো বাংলাদেশসহ দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সেই উন্নয়ন ধারারই উত্তরসুরী। জন্মশতবর্ষে আমি এই মহান নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।■

● উপদেষ্টা সম্পাদক, প্রত্যয়
নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

ষষ্ঠ বর্ষে প্রত্যয়

২০১৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বুরো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র "প্রত্যয়"-এর প্রথম সংখ্যা। ২০২০-এর জুলাই সংখ্যা-২১ প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঁচ বছর পূর্ণ হলো এই প্রকাশনার। বিগত পাঁচ বছরে প্রত্যয় এগিয়েছে অনেকদূর। এটি এখন আর বুরো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুখপত্র নয়, বরং ক্রমশ নিজেকে গড়ে নিচ্ছে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সেক্টরের মুখপত্র হিসেবে। বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনের চিন্তার ফসল এই প্রকাশনা ১২ পৃষ্ঠা নিয়ে যাত্রা শুরু করে এখন মুদ্রিত হচ্ছে ৪৪ পৃষ্ঠায়। প্রত্যয়ের কলেবর যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মানসম্পন্ন লেখা ও বিষয়বস্তুর পরিধি। প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত হয়েছেন দেশের অনেক গুণী লেখক। শৈল্পিক প্রচ্ছদ ও দৃষ্টিনন্দন অলঙ্করণের কারণে পাঠক মহলে ইতোমধ্যেই সমাদৃত হয়েছে প্রকাশনাটি।

বিগত পাঁচ বছরে প্রত্যয়ের মুদ্রণ ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি। কিন্তু গত মার্চে করোনাভাইরাসজনিত বৈশ্বিক মহামারির কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা স্থবির হয়ে পড়লে প্রত্যয়ের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যাটির প্রকাশনা বাতিল করতে হয়। দীর্ঘ চার মাসের লকডাউন শেষে প্রকাশিত হয় 'করোনাভাইরাস সংখ্যা'। ঘটনাচক্রে প্রত্যয়ের পাঁচ বছর পূর্তি সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে নজিরবিহীন এক বিষয়বস্তু দিয়ে। করোনাভাইরাস নিয়ে মানুষ ইতোমধ্যেই সচেতন হয়ে উঠেছে, তারপরও প্রত্যয়ের এই সংখ্যাটি সেই সচেতনতার একটি চমৎকার দলিল হিসেবে রয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

প্রত্যয়ের ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পন ঘটলো "মুজিব জন্মশতবর্ষ" সংখ্যা দিয়ে। আমরা চেয়েছিলাম সংখ্যাটি এপ্রিলেই বের করতে। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে এটি এখন হয়ে গেছে ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে কেন্দ্র করে প্রত্যয়ের নববর্ষে পদার্পন আমাদের আনন্দিত করেছে।

প্রত্যয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা সম্পাদক জাকির হোসেন প্রথম সংখ্যায় শুভেচ্ছা বাণীতে লিখেছিলেন,"...জনমানুষের সাফল্যগাথা, তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং দরিদ্র নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের তথ্য অন্যদের কাছে তুলে ধরাও আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।" সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলো, "মূলত, প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশ প্রত্যয় প্রকাশ করছে।" এই লক্ষ্য থেকে প্রত্যয় বিচ্যুত হয়নি। বিগত প্রতিটি সংখ্যায় সম্পাদনা পরিষদ চেষ্টা করেছে দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও তাদের সাফল্যের তথ্য প্রত্যয়ের পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে। বর্ধিত পরিসরে আগামী দিনগুলোতেও আমাদের এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন আরো জোড়ালো হবে।

সম্প্রতি প্রত্যয়ে যুক্ত হয়েছে সাহিত্য বিভাগ। প্রত্যয়ের অগ্রযাত্রায় দেশের সৃজনশীল ব্যক্তিদের পাশে রাখা এবং উদীয়মান কবি-লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা করাই এই বিভাগের উদ্দেশ্য। উন্নয়ন সেক্টরের মুখপত্র হলেও এই সেক্টরের বাইরে বিপুল সংখ্যক পাঠকের কাছেও আমরা প্রত্যয়কে তুলে ধরতে চাই। সে লক্ষে দেশে ও বিদেশে পাঠক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যয়ের একটি ওয়েবসাইট চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করছি 'মুজিব জন্মশতবর্ষ সংখ্যা'র মাধ্যমে পাঠক অনলাইনেও প্রত্যয় পড়ার সুযোগ পাবেন। খবরাখবর বিভাগে আমরা চেষ্টা করছি বাংলাদেশের ছোট-বড় সব এনজিও-এমএফআই-এর সচিত্র খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে। এ লক্ষে প্রত্যয় সম্পাদনা টিম নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সাথে। শুধু সচিত্র সংবাদই নয়, সমাজ পরিবর্তন ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাওয়া বিভিন্ন এনজিও ও এমএফআই-এর কার্যক্রম নিয়েও আমরা প্রতিবেদন প্রকাশ করছি। ইতোমধ্যে ব্র্যাকের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদকে নিয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ এবং আশা, ডরপ, চট্টগ্রামের ঘাসফুল ও ইপসা'র কার্যক্রম তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের এনজিওদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ আপাতত স্থগিত থাকলেও দ্রুতই এই উদ্যোগ আবার সচল হবে।

বিগত সময়ে প্রত্যয়কে গতিশীল রাখার জন্য গভীর আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করেছেন সম্মানিত পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, কোঅর্ডিনেটর-প্রশিক্ষণ নজরুল ইসলাম, রেমিটেন্স বিভাগের প্রধান এসএমএ রকিব এবং মনিটরিং ও রিপোর্টিং বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা নার্গিস ইসলাম। আমরা তাদের অভিবাদন জানাই।

প্রত্যয় শুধু পাঠকের হাতেই নয়, পৌঁছতে চায় তাদের হৃদয়েও। তাই পাঠকের অনুভূতি ও মতামত আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেমন বলতে চাই, তেমনি শুনতেও চাই পাঠকের কথা। প্রত্যয়ের মানোন্নয়নের জন্য কেউ তার মূল্যবান মতামত কিংবা পরামর্শ দিলে আমরা স্বাগত জানাবো। উন্নত হয়ে উন্নয়নের কথা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে প্রত্যয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

● নির্বাহী সম্পাদক

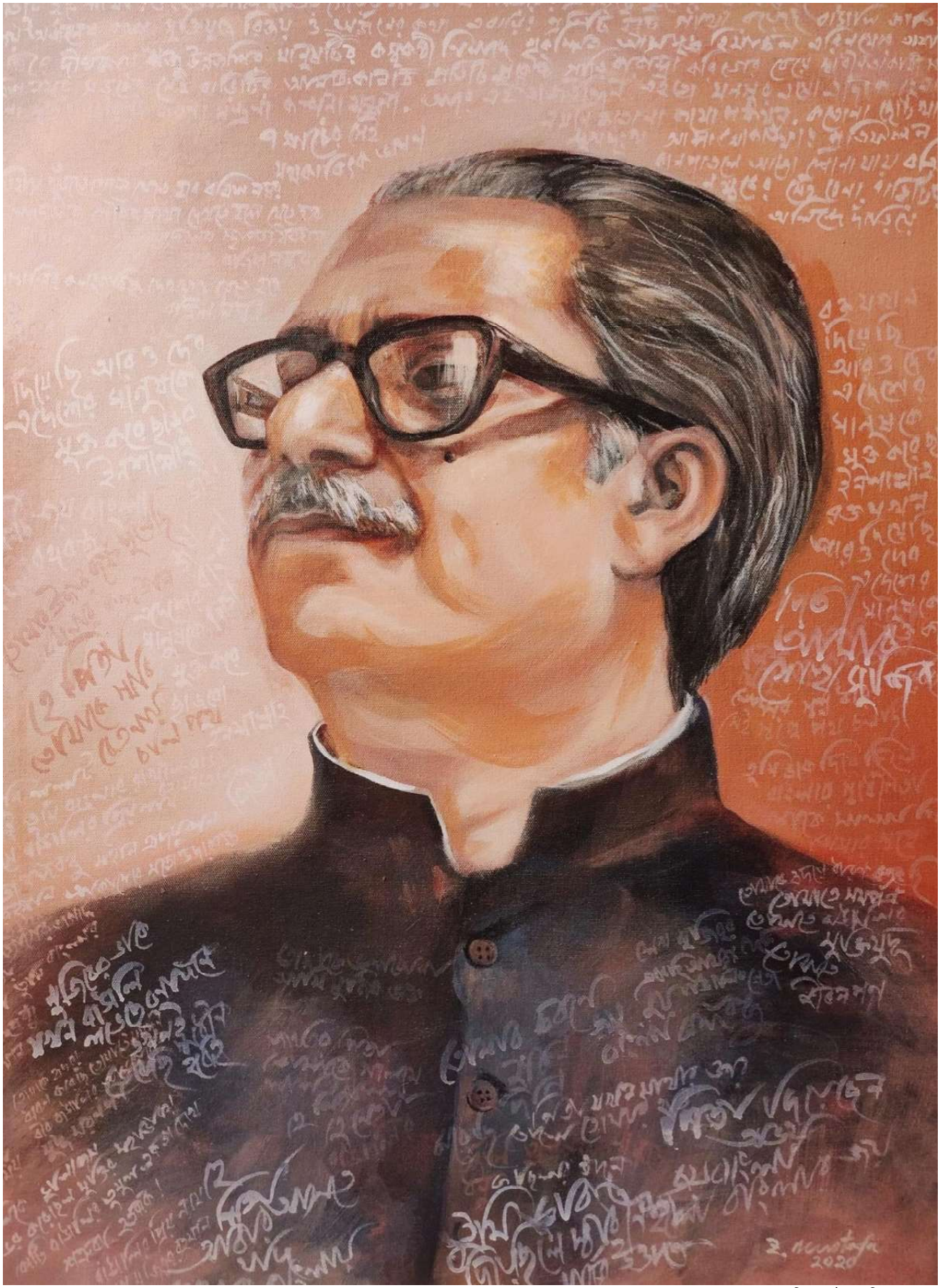

চিত্রকর্ম : জাহিদ মুস্তাফা

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ঘটেছিল। আর তার পঁচিশ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল আরেকটি বিজয়। মুক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর পদার্পণ ছিল জাতীয় বীরের বেশে। যে কথা তিনি বলেছিলেন সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ'–অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছিলেন। এতটুকু নত হননি, দুর্বল হননি, মনোবল হারাননি। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ছিল তার প্রবল। তার উঁচু মাথা দেশের জনগণকে করেছে মহিমান্বিত। গোটা দেশের মানুষের বিপুল সমর্থনই তাকে করেছে দৃঢ়চেতা, আপসহীন। তাকে দিয়েছে বীরত্বের মহিমা। মৃত্যুভয়কে এড়িয়ে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলার মধ্য দিয়েই তিনি উন্নীত হয়েছিলেন জাতীয় বীরের মর্যাদায়। বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতি হয়ে ওঠে অন্তর্লীন সত্তা। সে কারণে তার এই প্রত্যাবর্তনে চুনকালি পড়েছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের মুখে। যারা লিপ্ত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে বাঙালি জাতিকে পদানত রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে।

১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সার্থকতারও এক শীর্ষ মুহূর্ত। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সাহসী। এই সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতাই তাকে অল্প বয়সে অধিষ্ঠিত করেছিল জাতীয় নেতার আসনে। পাকিস্তান শাষিত বাংলাদেশে সকল প্রকার শোষণ ও দলন-পীড়নের বিরুদ্ধে তার কণ্ঠই ছিল আগাগোড়া সবচেয়ে বেশি উচ্চ, সতেজ ও সোচ্চার। এভাবেই তিনি গত শতকের ষাটের দশকে তুলনামূলক কম বয়সে আওয়ামী লীগের মতো একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আর এরূপ দায়িত্ব পেয়ে বাঙালির মুক্তিকামনার বাইরে একটি মুহূর্তও তিনি ব্যয় করেননি। ১৯৬৬ সালে তার উত্থাপিত ৬ দফা পরিণত হয়েছিল বাঙালির মুক্তিসনদে। এ দেশের জনগণ তার এই ৬ দফা দাবির সঙ্গে এতই একাত্ম হয়ে পড়েছিল যে শাসকশক্তি তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার যতই পরিকল্পনা করুক তা আর বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গ্রেফতার, হয়রানি, মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানোসহ নানা উদ্যোগ শাসকমহল থেকে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকর হতে পারেনি তার ও তার দাবির প্রতি জনগণের উত্তরোত্তর সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাকে ফাঁসি দেয়ার সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরও আইয়ুবের সামরিক শাসকশক্তি ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রবল অভিঘাতে তাকে শুধু মুক্তি দিতেই

বাধ্য হয়নি, আইয়ুব নিজেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়ে। জনগণের শক্তি যে সব কিছুর উর্ধ্বে তা গভীরভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি ভূষিত হন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। এই উপাধির মধ্যে মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা এত গভীরভাবে নিহিত থাকে যে তার নিজের নামটাই এর কাছে ঢাকা পড়ে যায়। অতঃপর তিনি বঙ্গবন্ধু নামেই ব্যাপকভাবে সম্বোধিত হতে থাকেন। হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির একচ্ছত্র নেতা ও বন্ধু।

আইয়ুবের পরিবর্তে আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া ক্ষমতাসীন হলেও জনদাবিকে অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সামরিক কালাকানুনের আওতাধীনে হলেও ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি তাকে পূরণ করতে হয়। জনগণের ওপর ব্যাপকভাবে আস্থাশীলতার কারণে বঙ্গবন্ধুও ওই কালাকানুনের মধ্যেই নির্বাচনে যেতে স্বীকৃত হন। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম সাধারণ নির্বাচন এবং তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জিতে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন সমগ্র পাকিস্তানেরই সর্বোচ্চ জননন্দিত নেতা। আর বাংলাদেশে তার জয় ছিল একচ্ছত্র। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ৬-দফা, বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের শতভাগ সমর্থন প্রকাশ করে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্রের স্বভাববৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাঙালির গণরায়কে অস্বীকার করার ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে স্বীকৃতি দিতে, তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বরণ করতে, এমনকী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানেও নানারকম টালবাহানার আশ্রয় নেয় সামরিক শাসকচক্র। এবং ইয়াহিয়াকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। চাপের মুখে সরকার জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডেকেও ১৯৭১ সালের ১ মার্চ তা স্থগিত করলে সমগ্র বাঙালি জাতি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, ক্ষোভে-রোষে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালির অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত এই অসহযোগ আন্দোলনে বেসামরিক প্রশাসনসহ সমগ্র জনগণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্ব। ক্ষমতায় আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত না হলেও বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নির্দেশেই পরিচালিত হয় তদানীন্তন সারা পূর্ব পাকিস্তান। একমাত্র সামরিক প্রশাসন ছাড়া পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। এই পটভূমিতেই বঙ্গবন্ধু তার সাত মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাকামী মানুষের সামনে তুলে ধরেন ভবিষ্যৎ করণীয়।

এ ভাষণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও সেটিই ছিল স্বাধীনতার কার্যত (de facto) ঘোষণা। তিনি যখন বলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো', 'যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে' এবং সবশেষে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– তখন তার বক্তব্যের সারার্থ অনুধাবনে কারও বেগ পেতে হয় না। এই ভাষণের পথ ধরেই বাঙালি জাতি প্রস্তুতি নিতে থাকে। আর ষড়যন্ত্রকারী সামরিক জান্তা প্রস্তুতি নিতে থাকে বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহাকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দমনের। আলোচনার নামে শুধু সামরিক প্রস্তুতির জন্য কালক্ষেপণ করা হয়। অতঃপর পঁচিশ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর।

বঙ্গবন্ধু পঁচিশ মার্চ রাত ১২টার পর, অর্থাৎ ছাব্বিশ মার্চের প্রথম প্রহরে, পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগেই, বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। সামরিক বাহিনীর আক্রমণের নীলনকশা সম্পর্কে তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি অন্য সকল নেতাকর্মীকে আত্মগোপনে গিয়ে, এমনকি দেশত্যাগ করে হলেও স্বাধীনতাযুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু নিজে এর কোনো পথ গ্রহণ করেননি। কেননা সেটা তার মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে মানানসই ছিল না। যিনি একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা হিসেবে সরকার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তার পক্ষে আত্মগোপন করা কিংবা অন্য কোনো দেশে আশ্রয় প্রার্থনা শোভনীয় বলে তার কাছে মনে হয়নি। তাছাড়া, পরে তিনি যা বলেছেন, পাকিস্তান সরকারের কাছে তিনিই বড় শত্রু, তাকে না পেলে তারা আরও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠত; সেটা তিনি ঘটতে দিতে চাননি। বরং তার চেয়ে জীবনের সর্বোচ্চ ঝুঁকিই তিনি নিলেন। গ্রেফতার করার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো পাকিস্তানে; সেখানে তাকে রাখা হলো কারাগারে। গোপন বিচারের মাধ্যমে তার ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তার কারাগারের পাশেই তার জন্য কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। এসব কিছুর মধ্যেই তিনি ছিলেন অবিচল। তার এই অবিচলতার মূলে ছিল একটি দেশের সমগ্র মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। জনগণের স্বাধীনতাকামী সকল আবেগকে তিনি নিজ

বুকে স্থান দিয়ে সকল ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। বাংলাদেশে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে তাকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে তাকে রাখা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন তার প্রতি দেশের প্রতিটি মানুষের গভীর ভালোবাসা সম্পর্কে, নিশ্চিত ছিলেন মানুষের স্বাধীনতার আবেগ সম্পর্কে, যাকে সামরিক শক্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। এসবই তাকে দৃঢ়চিত্ত হতে সাহায্য করেছে। সাহস জুগিয়েছে তার বুকে। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ও বন্ধবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুকে সর্বদাই রেখেছে 'উন্নত শির' দৃঢ়চিত্ত, অসীম সাহসী ও জনবৎসল।

তিনি সামরিক জান্তার হাতে গ্রেফতার হয়ে তাদের কারাগারে আবদ্ধ থাকলেও বাংলার মানুষ তাকে এক মুহূর্তের জন্য ভোলেনি। তার নাম নিয়ে মানুষ যুদ্ধ করেছে, বিপুল ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সকল হিংস্রতা ও বর্বরতাকে মোকাবেলা করেছে। যুদ্ধের ৯ মাস মানুষ 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' এই একটি স্লোগান উচ্চারণ করেই যুদ্ধ করেছে। এটি ছিল বাঙালির রণধ্বনি বা যুদ্ধ নিনাদ। নেতৃত্বের আসনে রেখে তারই সাহসী চেতনার দ্বারা সাহস সঞ্চয় করে মুক্তিযুদ্ধসহ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এ দেশের মানুষ। তারই যোগ্য উত্তরসূরি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ ওই ৯ মাস নেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংসার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতোই একপ্রকার কারাবাসের জীবনই ছিল তার। একজন ব্যক্তির দেশপ্রেম, তার দৃঢ়তা, সাহস ও আপসহীনতা কতটা সুউচ্চ হলে তিনি জনগণের হৃদয়ে এতটা শ্রদ্ধা ও আস্থার আসন অর্জন করতে পারেন বঙ্গবন্ধু তার এক গৌরবময় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। সুতরাং বাঙালির যুদ্ধজয় এবং বেঁচে থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আরেক বিজয়– এই দুইয়ের পেছনেই ছিল এ দেশের মানুষের গভীর দেশপ্রেম এবং তাদের নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শুধু দেশের মানুষ নয়, তিনি এর মধ্য দিয়ে অর্জন করেছিলেন বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বিশ্ব জনমতের চাপেই পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্রের পক্ষে তাকে ফাঁসি দেয়া যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি একই কারণে তাকে তারা মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। সমগ্র জাতির জন্য গভীরভাবে শিক্ষণীয় একটি দিক এই ঘটনার মধ্যে আছে। বঙ্গবন্ধু হিসেবে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন আর সেখান থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন জাতির জনক হিসেবে। দেশকে, দেশের মানুষকে একাগ্রচিত্তে ভালোবেসে, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সাহসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার এরূপ হয়ে ওঠা– বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির জনক। মানুষের ভালোবাসা ও স্বাধীনতার আবেগকে ধারণ করেই তিনি অর্জন করেছিলেন এই শক্তি ও সাহস। আর এই অর্জনের পেছনে ছিল নিঃস্বার্থ ত্যাগের মহিমা। বিপুল ত্যাগ স্বীকার ছাড়া বড় কিছু অর্জন করা যায় না। নিঃস্বার্থভাবে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হলে তার বিনিময়ে মানুষের গভীর ভালোবাসা পাওয়া যায়। চিত্তকে ভয়শূন্য রেখে শিরকে উচ্চ মহিমায় দৃঢ় রাখতে তিনি পেরেছিলেন এভাবেই। আজও দেশকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, বড় কিছু অর্জন করতে হলে এরূপ ত্যাগ স্বীকারের বিকল্প নেই, গভীর দেশপ্রেমেরও বিকল্প নেই। স্বার্থপরায়ণতা ও ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হলে আমরা বারবার হোঁচট খাব এবং মুখ থুবড়ে পড়ব। তাতে জাতির কল্যাণ সাধন শুধু ব্যাহতই হবে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এক সাংবাদিকের 'স্যার, আজকের দিনে জাতিকে আপনি কি বাণী শুনাবেন' প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু তার চোখেমুখে স্বভাবসুলভ উদার হাসি দিয়ে আবৃত্তি করেন–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

এই বিশ্বাস নিয়েই বঙ্গবন্ধু পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি আমাদের সতত শ্রদ্ধা ■

● লেখক : সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহসী জাতির প্রত্যয়ী উচ্চারণ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এক বিদেশি সাংবাদিক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ সকাল থেকেই একজন দোভাষী খুঁজছিলেন, সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ভাষণ দেবেন তা তাৎক্ষণিক ইংরেজি করে তাকে শোনাবে, সে জন্য। দুপুরের আগে আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ হলো, বললাম ভাষণ শুরুর আগে টিএসসিতে এসে তার সঙ্গে রেসকোর্স মাঠে যাব। মাঠে সেদিন কত মানুষ ছিল, কেউ বলতে পারবে না। হয়তো ১০ লাখ। হয়তো আট লাখ। কিন্তু মনে আছে ভাষণ শুরুর আধঘণ্টা আগে যখন বিদেশি সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে বেরোই, মনে হলো সারা দেশ ভেঙে পড়েছে রেসকোর্স মাঠে। সাংবাদিকের জন্য মঞ্চের সামনে জায়গা ছিল। সাংবাদিক হাত ধরে আমাকে টেনে সেখানে নিয়ে গেলেন। আমি আমার কপালকে ধন্যবাদ দিলাম। এত সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পাব, ভাবতেও পারিনি।

বঙ্গবন্ধুকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। বক্তৃতা শুরুর আগে দু-একবার হাত দিয়ে মাথার চুল সমান করলেন; আকাশে একটা হেলিকপ্টার উড়ছিল। সেদিকে একবার তাকালেন। তারপর সামনের মানুষের দিকে গভীর দৃষ্টি ফেললেন। মনে হলো তাঁর চিন্তা সরে গিয়ে মুখে একটা প্রসন্ন ভাব যেন এলো। তিনি লেকটার্নের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। পুরো বক্তৃতাই এখন ডিভিডিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যা পাওয়া যায় না তা হচ্ছে ওই কুড়ি-বাইশ মিনিটের জাদু। সেই জাদুর স্পর্শ অনুভব করেছিল তারাই, যারা সেদিন রেসকোর্সে ছিল। বঙ্গবন্ধু কথা বলছিলেন না, তিনি যেন বাঙালি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের একটা মুখবন্ধ লিখছিলেন। যাতে প্রতিফলিত হচ্ছিল বাঙালি চরিত্রের শ্রেষ্ঠ প্রকাশগুলো– তাঁর সাহস আর সংকল্প, তাঁর আত্মদৃপ্ত এবং বলিষ্ঠ প্রত্যয়, তাঁর সততা আর সৌজন্য, তাঁর ভেতরের

আগুন এবং বারুদ। সারা মাঠের মানুষ নিঃশব্দে শুনছিল সেই জাদুময় ভাষণ, যা তাদের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তাদের এক একজন যোদ্ধায় পরিণত করছিল। এরকম গভীর আর জলদ কণ্ঠের ভাষণ বঙ্গবন্ধুও হয়তো আর দেননি এবং বক্তৃতাটি শেষ হলে কারও মনে কোনো সন্দেহ ছিল না তিনি কী চাইছেন। তিনি যা চাইছিলেন, আমরাও তা চাইছিলাম– বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং তাঁর ভাষণে তিনি মানুষকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। তাঁর ভাষণটি পাকিস্তানিরাও সঠিক পড়তে পেরেছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা কাপুরুষ ছিল এবং কাপুরুষরা যা করে তারাও তা করেছিল– ঘুমন্ত মানুষ, নারী ও পুরুষের ওপর তারা রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ছিল একটি সাহসী জাতির প্রত্যয়ী কিছু উচ্চারণ। বঙ্গবন্ধু নিজেও হয়তো পাকিস্তানিদের কাপুরুষতার ব্যাপকতাটা বুঝতে পারেননি, যদিও তাদের কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার বিষয়টি তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।

একটা দুঃখবোধ থেকে ভাষণটা তিনি শুরু করেছিলেন। 'আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।'–এভাবেই তাঁর ভাষণ শুরু। 'দুঃখ', 'দুঃখের বিষয়', 'দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়' এবং 'করুণ ইতিহাস'–শুরুর কয়েক মিনিটেই এরকম বর্ণনা তিনি কয়েকবার দিলেন। আমি প্রথম তিন-চার লাইন দ্রুত অনুবাদ করলাম, কিন্তু সাংবাদিক আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'আমি বরং ভাষণটা শুনি, তুমি যদি পার, মনে রাখার চেষ্টা কর, পরে আমাকে অনুবাদে শুনিও'–সাংবাদিক বললেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পুরোটা সময় সেই সাংবাদিক একাগ্রতা নিয়ে ঠায় বসেছিলেন– তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি প্রতিটি বাক্য বুঝছেন, যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাতে নয়, ইংরেজিতে ভাষণটা দিচ্ছেন। এবং আশ্চর্য, শুনতে শুনতে ভাষণটা আমার মাথায় একটা জায়গা করে নিল। বিকেলে চারুকলায় সাংবাদিককে যখন মূল বিষয়গুলো অনুবাদ করে দিচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম, আমার গলাতেও যেন আলাদা একটা জোর এসেছে, যেন ভাষণটা আমাকে আলাদা শক্তি জোগাচ্ছে। সাংবাদিক বললেন, কী ছিল শেখ সাহেবের ভাষণে? আমি কিছু বলার আগে তিনি নিজেই বললেন, 'নিশ্চয়ই জাদু। ইট ওয়াজ সিম্পলি ম্যাজিকাল', তিনি বললেন।

জাদু তো বটেই। ইতিহাসের কিছু কিছু সময় থাকে, যখন জাদুর প্রয়োজন হয়; যখন বাস্তব এমন কঠিন হয়ে পড়ে, পরিস্থিতি এমন প্রতিকূলে চলে যায় মানুষের একটা জাদুর ঘটনা না ঘটলে কিছুতেই মানুষ পথ খুঁজে পায় না, পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শিরদাঁড়াটা তাদের প্রয়োজনীয় দার্ঢ্য পায় না। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল সেই জাদুর ঘটনা। একাত্তরের মার্চের দিকে তাকান। ৭ মার্চের আগের ও পরের দিনগুলোর কথা ভাবুন। ৭ মার্চের পর বাংলাদেশের ইতিহাস বদলে গেল। আমরা বুঝে নিলাম, পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের উদ্ভট গৃহস্থালির দিন শেষ।

কী ছিল সেই ভাষণে?

আজকালকার রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা শুনলে দুঃখ হয়, খুব কমই কাউকে তার মনের ভাষা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে শুনি। বেশিরভাগ রাজনীতিক বাক্য সমাপ্ত করেন না, অশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনেক গুণগ্রাহী এবং অনুসারীকেও দেখি, তাঁর মতো গুছিয়ে বলতে একেবারেই অপারগ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোতে তিনি প্রতিটি বাক্য শেষ করতেন– একটি বাক্য থেকে অন্য বাক্যে তার যাত্রা হতো অবধারিত এবং যৌক্তিক। তিনি বুঝতেন কখন, কোথায়, কতটা আবেগ মাখাতে হবে কথায়; কোথায় দিতে হবে প্রেরণার বাণী অথবা কাজের উপদেশ।

৭ মার্চের ভাষণে তিনি আঞ্চলিক অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'শাসনতন্ত্র তৈয়ার' করা, 'বলে দেবার চাই যে', 'হুকুম দেবার না পারি', 'মায়নাপত্র নেবার পারে' এরকম বলেছেন। এক সময় যখন তিনি বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না'– মনে হলো, এখানে 'দাবিয়ে রাখতে পারবে না' বললে যেন তাঁর গলার আগুনটা ঠিকমতো উত্তাপ ছড়াতে পারত না। যে মুহূর্তে কথাগুলো তিনি বলছিলেন, সেটি একটি আরোহণের মুহূর্ত– যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে তিনি যুক্তির অংশটি প্রতিষ্ঠা করে 'দাবায়া রাখার' মুহূর্তে উঠে গেলেন আবেগ ও প্রত্যয়ের একটি চূড়ায়। ঠিক ওই সময়ে তার আঞ্চলিক ভাষা থেকে কয়েকটি শব্দ ধার নেওয়াটা যেন বাংলাদেশের প্রাণের উচ্চারণটি তীব্র স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রকাশ করার জন্য জরুরি হয়ে পড়ল।

> বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কেউ কেউ একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাই বটে। কবিরা যদি যথাস্থানে যথাশব্দ ব্যবহারে পারদর্শী হন, তাহলে বঙ্গবন্ধুও তো কবি। এ ভাষণটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই নির্বিকল্প, প্রতিটি শব্দই তাৎপর্যমণ্ডিত। বক্তৃতার শেষে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' একটি দু'পঙক্তির কবিতাই বটে।

অথচ তাঁর ভাষণের অনেক জায়গায় বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষাকে খুব সাজিয়ে ব্যবহার করেছেন– '২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস', অথবা 'বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' অথবা 'তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির মুদ্রিত রূপটি আমাদের এরকম একটা ভাবনার কাছে নিয়ে যায়– তিনি কি আগে লিখেছিলেন ভাষণটির একটি খসড়া? তা না হলে এত সুন্দর কী করে হয় তার বাংলা? এত সুঠাম বাক্যে কীভাবে তিনি সাজান তাঁর কথাগুলো?

বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি ভাষণ শুনেছি বলে আমি বলতে পারি, ওইদিন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত যাত্রায় ভাষণটি তিনি তাঁর মাথায় লিখে নিয়েছিলেন। মাত্র কুড়ি-বাইশ মিনিটের ভাষণ, কিন্তু কী বাঙময়। বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস থেকে নিয়ে সংগ্রামের রূপরেখা, মানুষের করণীয় এবং স্বাধীনতার একটা ঘোষণা– সবই তিনি ওই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলে দিলেন। বঙ্গবন্ধু ইংরেজি ভালোই জানতেন– স্বাধীনতার পর ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি শুনলে বোঝা যাবে, ইংরেজিতে তাঁর দখল মন্দ ছিল না। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণে তিনি অকারণে কোনো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেননি। 'প্রেসিডেন্ট', 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি' অথবা 'সেক্রেটারিয়েট', 'সুপ্রিম কোর্ট'– এসব শব্দ বা বর্ণনা ব্যবহার করেছেন; কিন্তু এগুলো তো ভাষার প্রতিদিনের ব্যবহারেই আমরা বলি। কিন্তু তিনি অর্থনৈতিককে ইকোনমিক বলেননি, সাংস্কৃতিককে কালচারাল বলেননি। মুক্তিকে ইন্ডিপেন্ডেন্স বলেননি, নেতৃবৃন্দ না বলে লিডার্স বলেননি। পুরো ভাষাটা বাংলার প্রাণবন্ত ব্যবহারের একটি দলিল, যা একই সঙ্গে শিক্ষাহীন গ্রামের মানুষ এবং শিক্ষিত শহুরে মানুষ বুঝতে পারবে। একাত্তরের ৭ মার্চ যারা রেসকোর্সে এসেছিল, তারা সবাই বুঝেছে, পরের দিন যখন রেডিওতে সেটি প্রচারিত হয়, সবাই বুঝেছে। আজও যখন ভাষণটি কেউ শোনেন– সমাজ বা বিত্তের যে প্রান্তেই তার অবস্থান, তিনি সেটি বোঝেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কেউ কেউ একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিতাই বটে। কবিরা যদি যথাস্থানে যথাশব্দ ব্যবহারে পারদর্শী হন, তাহলে বঙ্গবন্ধুও তো কবি। এ ভাষণটিতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই নির্বিকল্প, প্রতিটি শব্দই

তাৎপর্যমণ্ডিত। বক্তৃতার শেষে উচ্চারিত 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' একটি দু'পঙক্তির কবিতাই বটে। এখানে মুক্তি ও স্বাধীনতার দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যতটা রাজনৈতিক-ভৌগোলিক, মুক্তি ততটাই অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। একটি জাতি স্বাধীন হলেই সে মুক্ত হয় না। একটি দেশ অন্য কোনো দেশের আদর্শ ধারণ করে তার মুক্তিকে বিলিয়ে দিতে পারে। বঙ্গবন্ধু মুক্তির তাৎপর্য কী, তা জানতেন– তার কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না। স্পষ্ট কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সেদিন তাঁর শ্রোতারা দুটিই চেয়েছিল। কিন্তু মাত্র সাড়ে চার বছর পর তাঁর যে ঘাতকরা পাকিস্তানি কাপুরুষতার পুনরাবৃত্তি ঘটাল, তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও মুক্তি পায়নি। তারা পাকিস্তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধী, উগ্রবাদীরাও মুক্ত নয়। তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে পাকিস্তানি ভাবাদর্শ এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থ। বঙ্গবন্ধু সেই মুক্তি চেয়েছিলেন, যা স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি শুধু প্রত্যয় নয়, সৌজন্যে, সততায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি 'এহিয়া সাহেব', 'ভুট্টো সাহেব' বলেছেন একাধিকবার। তার কণ্ঠে হয়তো কিছুটা শ্লেষ ছিল। কিন্তু সৌজন্যও ছিল। একবার বলেছেন, 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব', কিন্তু ঠিক তারপর বলেছেন, 'তোমরা আমার ভাই– তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।' এই সৌজন্য পাকিস্তানি কোনো নেতা কোনোদিন দেখাতে পারেননি। এ জন্যই কি-না, ভুট্টো এত বিরাট জমিদার আর প্রতিপত্তিশালী রাজনীতিবিদ হয়েও বঙ্গবন্ধুর সামনে এলে বাহাদুরিটা মুলতবি রাখতেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি তুললে ভুট্টো হইচই শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তর্কে নামতে। ভুট্টো সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। অথচ জাতিসংঘে পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা দিতেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল যুক্তি এবং সততা, ভুট্টোর ছিল কপটতা আর অযুক্তি। বঙ্গবন্ধুর সামনে তার নিজেকে অরক্ষিত মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ধাপে ধাপে মানুষকে একটা সংকল্পের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। শুরুতে সেই দুঃখবোধ, তারপর পাকিস্তানিদের শঠতার ইতিহাস। শুরুতে মানুষের বোধের কাছে তাঁর প্রশ্ন 'কী অন্যায় করেছিলাম?' এবং একটু পরই ঠিক যখন মানুষ পাকিস্তানিদের শঠতার বিষয়টিকে ঘৃণা জানাতে শুরু করেছে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন, 'কী পেলাম আমরা?' এই প্রশ্নে যখন মানুষ একটা হিসাবের দিকে তাকাতে শুরু করেছে নিজেদের মতো করে, বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দিলেন, আমরা পয়সা দিয়ে যে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। কী সুন্দর, ঝরঝরে তার বাংলা। অথচ এই মুহূর্তটি মানুষের ঘৃণার একটা চরম বহিঃপ্রকাশের সময়ও। কিন্তু বঙ্গবন্ধু বাঙালির গুলি খাওয়ার প্রসঙ্গ থেকে আবার চলে গেলেন এহিয়া খানের প্রসঙ্গে এবং এ প্রসঙ্গের এক পর্যায়ে যখন বললেন, পাঁচ ঘণ্টা গোপন বৈঠক করে এহিয়া খান বক্তৃতা দিলেন আর সব দোষ দিলেন আমাকে ও বাংলার মানুষকে, রেসকোর্সের জনতার কাছে পক্ষ-প্রতিপক্ষের বিষয়টি স্থির নিশ্চিত হয়ে গেল। তারপরই দ্বিতীয়বারের মতো 'ভাইয়েরা আমার' বলে জানিয়ে দিলেন, 'ওই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে' তিনি অ্যাসেমব্লিতে যোগ দিতে পারবেন না। তারপরই শুরু হলো তাঁর ভাষণের সবচেয়ে কেজো অংশটা, যেখানে তিনি হরতালের ঘোষণা দিয়েছেন, হরতালে গরিব মানুষের যাতে কষ্ট না হয়, সে জন্য দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল' বলে তিনি যখন আহ্বান জানালেন এবং 'যা কিছু আছে' তা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোল, তখন মানুষের সামনে একটা পথ খুলে গেল। সে পথটি আমাদের নিয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধে।

একজন মানুষ এত সহজ ভাষায় মানুষের মনের ভেতরে, মাথার ভেতরে, রক্তের ভেতরে কীভাবে ঢুকে যেতে পারেন, তার প্রমাণ একাত্তরের ৭ মার্চে আমি পেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথা দূরবিস্তারি অনুরণন তুলছিল রেসকোর্সের মাঠে। মানুষ আন্দোলিত হচ্ছিল, উদ্বেলিত হচ্ছিল ভাষণটির প্রতিটি বাক্য শুনে। আঞ্চলিক শব্দ মিশিয়ে যে বাংলা তিনি সেদিন ব্যবহার করেছিলেন তাতে ইতিহাসের, লোকসংস্কৃতি আর জনজীবনের গভীরের দোলা অনুভব করা যাচ্ছিল। আজও যখন ভাষণটি শুনি, চোখ বন্ধ করলে বঙ্গবন্ধুর তেজোদীপ্ত চেহারাটা মনে ভেসে আসে। তাঁর কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে চাই আর অনেক দিন আগের সেই অপরাহ্নে ফিরে যাই। বিদেশি সাংবাদিক তার হোটেলে ফিরে যাওয়ার আগে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– এ ভাষণের পর কী হতে পারে। তিনি এক মুহূর্তে ভেবে বলেছিলেন, 'গেট রেডি পর দ্য ওর্স্ট– অ্যান্ড দ্য বেস্ট'। ওর্স্ট ছিল ২৫ মার্চের তারপর– বেস্টও ছিল ২৫ মার্চের বাঙালির জ্বলে ওঠা এবং স্বাধীনতাকে করতলগত করা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি শুনতে শুনতে ঠিক এই কথাগুলো, লাখ লাখ মানুষের মতো, আমিও ভাবছিলাম। ভাষণের শুরুতে বঙ্গবন্ধু যে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন, তা কি এই ওর্স্টের সম্ভাবনা ভেবে? সে জন্যই কি এতটা উদ্দীপ্ত ছিল তাঁর ভাষণ, এতটা সাবলীল এবং জাদুবিস্তারি– সেই ওর্স্টকে ছাড়িয়ে বেস্টের সাধনায় বাঙালিকে তৈরি করতে? তবে এটি তো নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভাষণটি শুধু একাত্তর নয়, সব সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক– যতদিন আমাদের সব ক্ষেত্রে মুক্তি না অর্জিত হবে ততদিন আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে এবং সাধনা চালিয়ে যেতে হবে 'বেস্ট'-এর জন্য।■

● লেখক : কথাসাহিত্যিক ও অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মওলানা ভাসানীর মুজিবের

সৈয়দ ইরফানুল বারী

প্রসঙ্গ কথা : বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সনের ১২ অক্টোবর সন্তোষে এসেছিলেন। মাজার জিয়ারতের পর তিনি মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভিত্তি ফলক উন্মোচন করেন। অতপর ১৫০০ জনের উপস্থিতিতে ভাষণ দেন মাজার সংলগ্ন ঈদগাহে নির্মিত স্টেজে। আমি তখনো ট্রাস্টের সেক্রেটারি। (চেয়ারম্যান– আওয়ামী লীগ নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল মান্নান এম.পি.) প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি আমি খুব মনোযোগী ছিলাম। তিনি মমতামাখা ভাষায় স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তাঁর মহান পিতা তাঁকে ও ভাই কামালকে নিয়ে কাগমারী এসেছিলেন। নিবিড় পারিবারিক বন্ধনের কথা বলেছিলেন।

বলেছিলেন, মওলানা ভাসানী ভাইবোন দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি বাদাম কিভাবে হয় দেখেছো? চল, ক্ষেতে চল, তোমাদেরকে দেখাই।' দেখানোর বর্ণনাটা প্রধানমন্ত্রী স্মিত হাসিতে বলেছিলেন। স্মিত হাসিতে এও বলেছিলেন, দুপুরে মজার খাবার ছিল, কিন্তু খুব ঝাল ছিল।

এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে যা বুঝাবে ভাসানী-মুজিব রাজনীতি অতিক্রম করে, খুব কাছাকাছি হয়েছিলেন নানান বন্ধনে। কিন্তু রাজনীতি যখন সামনে এসেছে তখন ভাসানী ভাসানীই, মুজিব মুজিবই থেকেছেন। ১৯৭৪ সনে ১৭ আগস্ট নিজ হাতে অতিশয় সাধারণ কাগজে তাড়াহুড়ায় লেখা এ পত্রখানা কী কথা বলে? যাঁকে ১৯৪৭ সনে সিলেট রেফারেন্ডাম থেকে হুজুর ডাকা শুরু করেছিলেন, জাতির জনক হয়েও তাঁকে ওভাবে সম্বোধন করে শান্তি পাচ্ছেন। ১৯৭৪ সনে দেশের অবস্থা মোটেই ভালো না। বৈদেশিক পরিস্থিতিও ভালো না। সব পাওয়ার মধ্যে কী-যেন হারানোর বেদনা। এমনি দিবা-রাত্রিতে হুজুর, আপনার কথা মনে পড়ে। ১৯৫০ দশকে আপনার চিকিৎসার জন্যে দ্বারে দ্বারে হাত পেতেছি। আজ যখন আমার হাতে আমার টাকা, দশ হাজার টাকা পাঠালাম, মনে যা চায় খাবেন। আমি জানি, নিজ থেকে কিছুই খান না, খেতে চান না। ভক্তি ভরে দিলে খান। এটা আমার ভক্তি। প্রাচ্যের ঐতিহ্য। আরেকটি কথা হুজুর, সরকারি পলিসিতে নাই, তবু আপনাকে খুশি করতে, আপনার রাজনৈতিক গুরুর নামে করা মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, সবাই বলে কাগমারী কলেজ, জাতীয়করণ হল। আমি চাই আপনার স্নেহ। 'আমি জানি, আপনি আমাকে ছেলের মত ভালোবাসেন।' তাইতো দেখুন, ছোট্ট চিঠিটিতে আমি দু'বার লিখেছি, 'আপনার প্রয়োজন আমাকে জানাবেন।' মুশকিল হল, আপনি জানান না। বুঝি, জানাবেনই-বা কিভাবে! সবাই এতে রাজনীতির গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। আপনিও তো রাজনীতি ছাড়েননি। মিটিং মিছিল হরতাল অনশন কোনটাই বাদ দেননি। আমার দিকে একবার তাকাবেন না? কতটুকু সম্ভব আর কতটুকু অসম্ভব! তাই চিঠিটিতে অভিমান ভরে লিখেছি, 'যাহা ইচ্ছা আপনি করেন আমার কিছুই বলবার নাই।'

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গ অনেকবার এসেছে। কোনো কোনো কথা মওলানা ভাসানীকে উজ্জ্বল করেছে। প্রসঙ্গত কটাক্ষের কথাও রয়েছে। লেখক এও লিখেছেন, জেল থেকে সবে বের হলেন। সামনে দণ্ডায়মান পিতা এবং মওলানা। দু'জনকেই পা ছুঁয়ে সালাম করলেন (পৃষ্ঠা-১২১)। যা সুন্দর ও স্বাভাবিক তা-ই করেছেন। কেউ যদি মনে করেন পা ছুঁয়ে

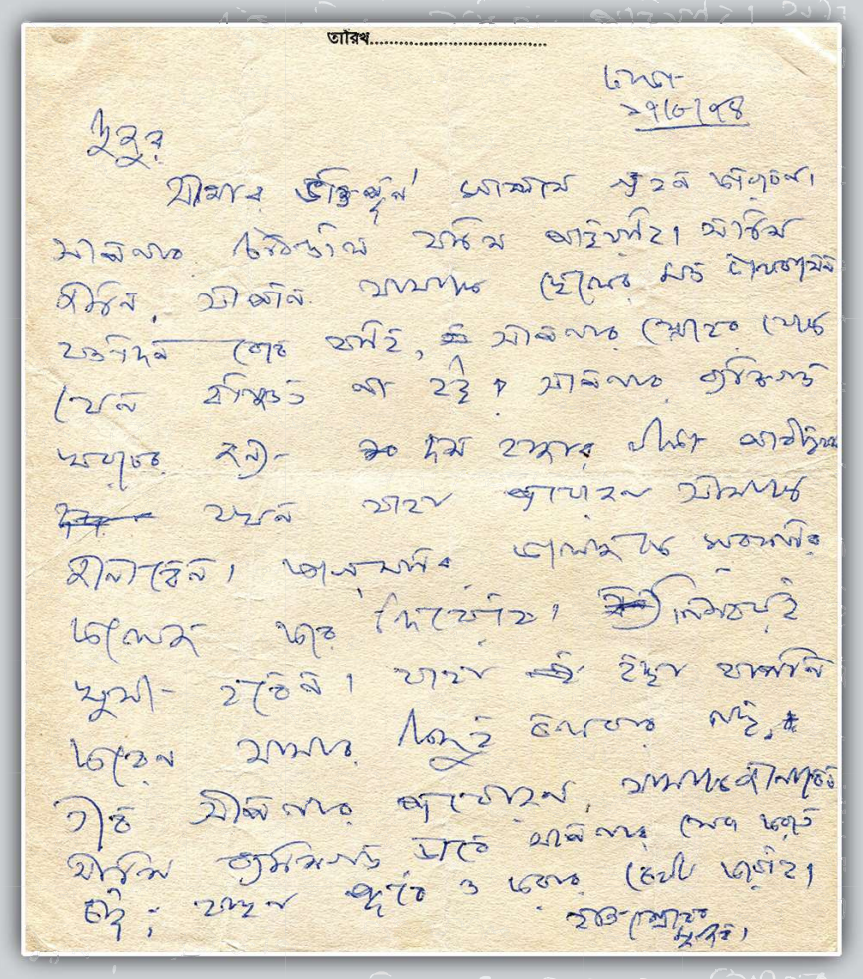
তারিখ.....

মওলানা ভাসানীকে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা চিঠি

ঢাকা
১৭/৮/৭৪

হুজুর
আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম গ্রহণ করিবেন। আপনার চিঠিগুলি আমি পাইয়াছি। আমি জানি, আপনি আমাকে ছেলের মত ভালোবাসেন। যতদিন বেঁচে আছি, আপনার স্নেহের থেকে যেন বঞ্চিত না হই। আপনার ব্যক্তিগত খরচের জন্য দশ হাজার টাকা পাঠাইলাম। যখন যাহা প্রয়োজন আমাকে জানাবেন। কাগমারি কলেজকে সরকারি কলেজ করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই খুসী হবেন। যাহা ইচ্ছা আপনি করেন আমার কিছুই বলবার নাই। তবে আপনার প্রয়োজন আমাকে জানাবেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সেবা করতে চাই; যাহা পূর্বে ও করার চেষ্টা করেছি।

ইতি
স্নেহের মুজিব

সালাম করার মধ্যে মান্যবরকে মানা এবং অন্তর দিয়ে আন্তরিক হওয়া নিশ্চিত হয়, তবে বলবো বঙ্গবন্ধু তাঁর 'হুজুরের' প্রতি আমৃত্যু তেমনটি ছিলেন। যখন তিনি দেশ ও জাতির সকল অর্থে সর্বেসর্বা তখনও তিনি তা বজায় রেখেছেন। মৃত্যুর মাত্র ৫ মাস আগে ০৮ মার্চ (১৯৭৫), আমরা দেখতে পাই, কাগমারীতে প্রোটোকল ও আনুষ্ঠানিকতা ছিন্নভিন্ন করে অন্তর-ছোঁয়া সালাম করছেন এবং ভারাক্রান্ত মনের মাথার ভার মওলানা ভাসানীর বুকে ঠেকিয়ে রেখেছেন। (এ দৃশ্যের ছবি বহুল প্রচারিত।)

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে পাই, ১৯৪৯ সনের ১২ অক্টোবর মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে বলছেন, সাবধান, তুমি গ্রেফতার হবে না। লাহোর যাও। সোহরাওয়ার্দিকে সব জানাও। পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ে তুলতে হবে। সোহরাওয়ার্দিকে নেতৃত্বে আসতে বল (পৃষ্ঠা-১৩৫)। সব ঠিকঠাক মত হয়েছিল। ১৯৫৩-র কাউন্সিল অধিবেশনে সিনিয়র নেতাদের বাদ দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ মুজিবুর রহমানকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন মওলানা ভাসানী। আজীবন সাংবাদিক ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগের এম. পি. এবিএম মূসা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার বেলা যে যায়'-তে লিখেছেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের তৃতীয় কাতারের নেতা। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দির পরই যাঁদের অবস্থান ছিল তাঁরা হলেন, আতাউর রহমান খান, কফিল উদ্দিন চৌধুরী, আবদুস সালাম খান প্রমুখ। তার পরই শেখ মুজিব ও তাঁর সমসাময়িক তরুণের দল। কয়েক বছর পর সেই মুজিবুরকে মওলানা ভাসানী সামনের কাতারে নিয়ে এসেছেন অন্য সবাইকে আড়াল করে। তাঁর মধ্যেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের দাবদাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যে আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল সবখানে।" (পৃষ্ঠা-১৯০)

অসমাপ্ত আত্মজীবনী ১৯৫৫-র এপ্রিলে সমাপ্ত হয়েছে। (এর পূর্ববর্তী এগার মাস মওলানা ভাসানী দেশে ছিলেন না।) আমরা পাইনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ এ বছরগুলোতে ভাসানী-মুজিব কার জন্য কে কতটুকু। ১৯৫৫-র অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ হয়েছিল আওয়ামী লীগ। সাধারণ সম্পাদক পুনর্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ কাউন্সিলে ১৯৫৩ সনের ২১ দফার প্রতিধ্বনি করেছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন এবং জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি বাস্তবায়নের প্রশ্নে তখনো ভাসানী-মুজিব রাজনীতি একমুখী। ১৯৫৬-র শুরুতে পূর্ব বাংলায়, সেপ্টেম্বরে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার ভাগীদার হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা এবং আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণের সার্বিক সুযোগ তখন হস্তগত। মওলানা ভাসানী দেখতে পেলেন সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। কাগমারীতে ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে আবার কাউন্সিল। সমাধান তো হলই না, হলো ভাঙন, ভাসানী-মুজিব রাজনীতির যবনিকা। আমরা তখন দেখতে পাই, মওলানা ভাসানীকে ধরে রেখে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সমুন্নত রাখার আন্তরিক প্রয়াস ছিল সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল বা করা হয়েছিল।

কাগমারী সম্মেলনের পর ১৮-১৯ বছর জীবিত ও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন উভয় নেতা। এদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবসান কোনো দিন হয়নি। উভয়ই যেন কাছাকাছি হবার আকর্ষণ অনুভব করতেন। আবদুল গাফফার চৌধুরী, ফয়েজ আহমদ, এবিএম মূসা, আতাউস সামাদ, ফজলে লোহানী, এনায়েতুল্লা খান প্রমুখ জাঁদরেল সাংবাদিকবৃন্দ অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছেন ও লিখেছেন দু'নেতার নৈকট্য ও অনৈক্য এবং একই সাথে ব্যক্তিগত স্নেহ ও শ্রদ্ধা। ফয়েজ আহমদ, ফজলে লোহানী, এনায়েতুল্লা খান

মওলানা ভাসানীর দিকে অধিকতর ঝুঁকে থাকতেন। কোনো কোনো সময় মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে কাছে টানলে অথবা বঙ্গবন্ধু কাছাকাছি হলে এরা মওলানা ভাসানীরই সমালোচনা করতেন। তাঁরা বলতেন বা লিখতেন, 'সবকিছুর ঊর্ধ্বে এঁদের একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু এতে ক্ষতিটা হয় মওলানা ভাসানীর।'

১৯৬৮ সনের ডিসেম্বর থেকে মওলানা ভাসানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতনের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সাংবাদিক আতাউস সামাদের মাধ্যমে ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে বন্দী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি ম্যাসেজ মওলানা ভাসানীর নিকট পৌঁছে। পল্টনের জনসভায় (১৬ ফেব্রুয়ারি) তিনি ঘোষণা দেন, ফরাসী বিপ্লবে যেভাবে বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটানো হয়েছিল, ঠিক তেমনি শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করা হবে। বিপ্লবী পরিস্থিতি ইতোমধ্যে দেখা দিচ্ছিল, তন্মধ্যে মওলানা ভাসানীর হুঙ্কার বাঁধ-ভাঙ্গা জন-জোয়ার সৃষ্টি করল। পিণ্ডি হিসাব করল, বামপন্থীদের হাতে দেশ ছেড়ে দেয়া যায় না। ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামী মুক্তিলাভ করেন এবং মামলাও প্রত্যাহার করা হয়। সেদিন সন্ধ্যায় ভাসানী সকাশে শেখ মুজিব হাজির হন। এর বর্ণনা লিখেছেন আজকাল (২০১৮) সিপিবি-র নেতা হায়দার আকবর খান রনো তাঁর 'শতাব্দী পেরিয়ে' গ্রন্থে। "সেইদিন সন্ধ্যা বেলায় শেখ মুজিবুর রহমান হঠাৎ করে ন্যাপ নেতা সাইদুল হাসানের বাসায় চলে আসেন কোনরকম খবর দেয়া ছাড়াই। তাঁর সঙ্গে দুই চারজন লোক থাকলেও, নেতৃস্থানীয় কেউ ছিলেন না। আমি তখন সাইদুল হাসানের বাসায় ছিলাম। ন্যাপের আরো অনেকে ছিলেন। কারণ, মওলানা ভাসানী সেখানে অবস্থান করছেন। বস্তুত ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই শেখ মুজিব এসেছেন। আমরা তো অবাক। পরিচিতজনদের সাথে কুশল বিনিময় করে তিনি সোজা চলে গেলেন ভাসানী যে ঘরে ছিলেন সে ঘরে। ভাসানীর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। তারপর দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে দু'জনে প্রায় মিনিট বিশেক কি কথা বললেন জানি না। বেশ উৎফুল্লচিত্তে বেরিয়ে এসে আর বেশিক্ষণ থাকেননি।" (পৃষ্ঠা-১৮৪) এ সখ্য, এ আনন্দ এক মাসও থাকেনি। আইয়ুব আহূত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব গেলেন, মওলানা ভাসানী যাননি। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল। ১৪ মার্চ (১৯৬৯) শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন। বিমানবন্দরে তাঁকে দেয়া বিরাট সংবর্ধনায় অন্যদের সমালোচনার পাশাপাশি 'মওলানা ভাসানী সম্পর্কেও তিনি খুব খারাপ মন্তব্য করেছিলেন।' হায়দার আকবর খান রনো বর্ণিত গ্রন্থে লিখেছেন, "তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলেছিলেন, বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, তাই আবোল তাবোল বলছেন, এখন তাঁর (মওলানা ভাসানী) রাজনীতি থেকে রিটায়ার করা উচিত। ভাসানী সম্পর্কে তার এই মন্তব্য তখন বিভিন্ন মহলে নিন্দিত হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের এই রকম মন্তব্যের কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত বন্দী অবস্থায় আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর যে সমঝোতা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, ভাসানীকে সে ক্ষেত্রে তিনি বাধা হিসাবে মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত যদিও তখন শেখ মুজিবুর রহমান ভাসানীকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে, যে ধরণের জনপ্রিয়তা পৃথিবীর খুব কম নেতার ভাগ্যে জুটেছে, তবু তিনি সম্ভাব্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চাননি। যাহোক, তার এই আচরণ এত বড় নেতার ভাবমূর্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮৭)

মাত্র দু'বছরের মাথায় দেখা যায় দেশ ও জাতির প্রশ্নে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ। মওলানা ভাসানী ১৯৭০ সনের ২৩ নভেম্বর থেকে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' বলে যাচ্ছিলেন, স্লোগান হচ্ছিল 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো-পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'– আপাত ধারণা ছিল দুটি স্রোত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত ৭ মার্চ (১৯৭১) যখন আসল মওলানা ভাসানীও জন্ম দিলেন ৯ মার্চে। স্রোত একটি হয়ে গেল। পল্টনের জনসভায় তিনি বললেন, 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। মুজিবর আমার ছেলের মত। স্বাধীনতার জন্য আবার আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করব।' মার্চের ১৪ থেকে ২২ পর্যন্ত মওলানা ভাসানী অবস্থান করেছিলেন চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলামের বাড়িতে। এ বাড়ির ল্যান্ড ফোনে একাধিকবার মওলানার সাথে কথা বলেছিলেন শেখ মুজিব।

বাংলাদেশ সময়ের ভাসানী-মুজিব রাজনৈতিক সম্পর্ক জটিল আবর্তে ঘুরপাক খায়। এ 'প্রসঙ্গ কথা'-তে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ চাহিদা মিটাতে পারে। প্রভূত তথ্য বিদ্যমান। সার কথা হল : মওলানা ভাসানীর ও শেখ মুজিবুর রহমানের শ্রেণি-আকাঙ্ক্ষা এক ছিল না। জীবনবোধ এক নয়। তাই রাজনীতিও এক হবার নয়। যদি কেউ একযোগে দুজনকে নিয়ে চলতে চান, পারবেন না। একজনের পৃষ্ঠে আরেকজনকে যাচাই করা যথার্থ হবেনা। দুজনের রাজনৈতিক মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন।

অসুস্থ মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে দেখতে হাসপাতালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে মাওলানা ভাসানীর সহধর্মিনী আলেমা খাতুন ভাসানী।

মওলানা ভাসানীর শেষ দিনগুলো সম্পর্কে কমরেড বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক যোদ্ধা হিসেবে ভারত, রাশিয়া ও মার্কিনের, বিশেষ করে ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছেন। বার্ধক্য এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ভারতের ফারাক্কা নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের মে মাসে জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং রাজশাহী থেকে কানসাট পর্যন্ত মিছিল পরিচালনার কর্মসূচী ঘোষণা ও কার্যকর করেছেন। এটাই ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আহ্বান ও কর্মসূচী। দেশের স্বাধীনতা ও জাতির মুক্তির জন্য যিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছিলেন, তিনি অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জীবনের শেষ পর্যায়ে এভাবেই একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কৃষক গণতন্ত্রী হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করেন।" (আমাদের সময়কার জীবন, পৃষ্ঠা-৩০)

বাংলাদেশ সময়ের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক শ্রুতিলিখনে বলেছেন, "যে সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে (মুক্তিযুদ্ধকালে) তাজউদ্দীনকে কাজ করতে হয়েছে, সেই দুর্বলতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকেও কাজ করতে হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকারের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তখন সেনাবাহিনীর ভেতর ঐক্য দৃঢ় হয়নি। বিরোধী দল হিসেবে জাসদ গঠিত হয়েছে। মওলানা ভাসানী ও পিকিংপন্থীরা সরকারবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। মোজাফফর আহমদ ও মস্কোপন্থীরা এক বছর সরকারের বিরোধিতা করে এবং পরে সরকারকে সমর্থন দেয়। দেশে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা প্রবল হয়ে ওঠে। নানারকম অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপও দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর সরকারকে বিপন্ন করার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চালাতে থাকে। সে অবস্থাতেও বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য এবং জনজীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। বন্যার কারণে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসহযোগিতার জন্য ১৯৭৪ সালে দেশে একটি বড় দুর্ভিক্ষ হয়। বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য এবং জন জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর প্রতি দ্বিতীয় বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গঠন করেন একদলীয় ব্যবস্থা 'বাকশাল'। কিন্তু তার আগে তিনি তাজউদ্দীনকে মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করেছিলেন। বাকশালের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিহত হন। মূল ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন।" (দ্রষ্টব্য- দৈনিক যুগান্তর, ৬ আগস্ট ২০১৭)

পুনশ্চ : ঘটনা ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের। গভীর রাত্রিতে সন্তোষে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। এমনি আসা তিন মাস আগেও হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। তখন বলতে এসেছিলেন, তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের নিকট ধর্না দিতে হচ্ছে। এবারে মওলানা ভাসানীকে জানাতে এসেছেন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত বাকশাল করতে হচ্ছে। দুজনে একান্তে কথা বললেন। কথোপকথনের ধারা বারান্তরে বলা যাবে। বসা হয়েছিল ট্রাস্টি বোর্ড বিল্ডিং-এর (এখন অতিথি ভবন) দক্ষিণ সারির একটি কক্ষে। সেবা দানের জন্য সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক কর্মী মোসলেম উদ্দিন সরকার ও আলিমউদ্দিন তালুকদার ছিলেন। দু'জনের জবানেই আমি এ বর্ণনা শুনেছি।

আজকের মাজার চত্বরে দাঁড়িয়ে বিদায়ী কথা বলছিলেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব। হঠাৎ হুজুর বলে উঠলেন, মুজিবর, এই সামনের ক্ষেতে উন্নত জাতের মুলা চাষ করেছি। (আজ তা ঈদগাহ।) পোলাপানের লাগি তুমি কয়টা নিয়ে যাও। এ-ই মোসলেম, ক্ষেত থেকে কয়টা আন্। মুজিবরের গাড়ীতে দে। আবার টুকটাক দুজনের কথা। মুলা গাড়ীর বনেটের ভেতর দেয়া হল। এখন বঙ্গবন্ধু গাড়ীতে উঠবেন। জিজ্ঞেস করলেন, মুলা কোথায়? গাড়ী-চালক বললেন, পেছনে রাখা আছে। বললেন, তা হবে কেন? হুজুর দিয়েছেন। সামনে আন। সিটে রাখ। তা-ই হল। নিশুতি রাতে গাড়ী সন্তোষ ছেড়ে চলে গেল। কারও হাতে ঘড়ি ছিলনা যে দেখবে, কয়টা বাজে।■

● লেখক : সাবেক সচিব
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী

আমার শেখ মুজিব

মোস্তাফিজ কারিগর

২০০৩। একটা আন্তর্জাতিক চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিলাম আমি। ঢাকা জাদুঘরে আয়োজিত হয়েছিলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেই পুরষ্কার নিতেই বাবার হাত ধরে প্রথম ঢাকা আসা আমার। সেবারে ঢাকা আসার পেছনে বাবার কাছে একটা প্রধান আবদার ছিলো– ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি দেখাতে হবে। খা খা দুপুর মাথায় করে বাবা আমাকে নিয়ে ঢুকলেন;– ৩২ নম্বর বাড়ি নয়, এক বিধ্বস্ত ইতিহাসের রক্ত-পিছল অন্ধকার গুহায়। ৩২ নম্বর বাড়ির এক একটা ঘরে যাচ্ছি, আর আমার কিশোর পা দুটো যেনো সড়াৎ পিছলে যাচ্ছে পিচ্ছিল রক্তে; আমার বাবার হাত চেপে ধরছি বার বার। দেয়ালে-দরজায় বুলেটের ক্ষত হিংস্র হায়েনার চোখের মতো আজও এক জঘন্য ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার কিশোর বুক কেপে উঠছে; আমি আবারো বাবার হাত চেপে ধরছি। রাসেলের রক্তাক্ত কচিদেহটা যেই ঘরে পড়েছিলো, প্রথমবারের মতো আমার বুকের ভেতর ডুকরে ওঠে সেই ঘরে ঢুকে। আমি দেখতে পাই ঘরের এক কোণে রাসেলের একটা লাল রঙের সাইকেল, রঙিন ডানাঅলা সাইকেল–সারা ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগলো সেই সাইকেল। মেজেতে ছড়ানো ছিটানো অজস্র খেলনা; অবিরাম ডেকে যাচ্ছে–রাসেল, রাসেল। রাসেল তো খেলনাদের ডাক শোনে না। রাসেল তো আসছে না। আমি কেমন মুষড়ে যেতে থাকি। বাবার হাত আমাকে কখন যে নিয়ে চলে এসেছে একটা সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির দেয়ালে ট্যাগ লাগানো লেখা থেকে জানতে পাই– ঘাতকের গুলিতে নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ পড়ে ছিল এই সিঁড়িতেই। আমার বুক হুহু করে ওঠে। গলার ভেতরটা কেমন আড়ষ্ঠ হয়ে যায়। আমি দেখতে পাই সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত এক মহান পুরুষ দীপ্ত পায়ে এই সিঁড়ি দিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছেন। সেই থেকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর একটা ছবি আমার মনের ভেতর আঁকা হয়ে যায়। অবশ্য আরো শৈশবে বাবা যখন আমাকে বাইসাইকেলের রডে বসিয়ে কুষ্টিয়ার গ্রামে গ্রামে জাতীয় নির্বাচনের সময় নৌকা মার্কার ভোট চেয়ে বেড়াতেন, বাবার হাতের ছোট ছোট রঙীন লিফলেটে উপরের কোণাতে ব্লকে ছাপা কালো কালিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ভোটের জয়-পরাজয় অস্ত যেতো, আমার বালক মনে জেগে থাকতো একটা ছবি। একটা মহাপুরুষের মুখ। সেই মুখ আমি বাড়ির দেয়ালে কতবার এঁকেছি, অংক খাতায়, স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডে।

একবার কলেজে পড়ার সময় একটা আবৃত্তির সংগঠনে যোগ দিই। পনেরো আগস্ট উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। বিচারকদের সামনে আমি গলা মুক্ত করে আবৃত্তি করতে থাকি–

"শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা- ;
কে রোধে তাঁহার বজ্র কণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শুনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।"

কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এতোটাই বিহ্বল যে, কবিতা পড়া শেষ করে আমি কেমন কাঁপতে থাকি যেনো। কেবল আমার মাথার নিউরণে এক আশ্চর্য দীপ্ত কণ্ঠস্বর নেচে নেচে উঠতে থাকে–

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এটা এক মহান কবির লেখা কবিতা। এই মহান কবি মাত্র এই দুই লাইন কবিতাই লিখেছেন জীবনে। এই কবির প্রকাশিত একটিই বই, সেই বইয়ের নাম– বাংলাদেশ। এটা অমিত প্রাণপ্রাচুর্যভরা দীপোৎদ্ভাসিত এক ঋষির মন্ত্র, সাত কোটি বাঙালিকে প্রাণস্পন্দনে জাগিয়ে তুলেছিলো স্বৈরশাসকের বারুদের বিরুদ্ধে।

কত কত গল্প কবিতা উপন্যাসের অক্ষর থেকে আরো মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই মহাপুরুষের মুখ আমার চেতনায়। পেশাগত জীবনে আমাকে বেশ কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকতে হয় প্রতিবছর। পত্রপত্রিকার জন্যে অলঙ্করণ করতে হয়। সেই সুযোগে কত লেখা পড়ার সুযোগ হয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে। কত ভাবে কত বার সেই আশ্চর্য আলোকোজ্জ্বল মুখটা একে যাচ্ছি বইয়ের প্রচ্ছদ বা অলঙ্করণের জন্যে। আঁকতে আঁকতে সেই মুখের সমস্ত রেখা যেনো আমার চেতনায় পদ্মা-গড়াইয়ের মতো বহমান। আহ্! সূর্যের মতো রাঙা সেই দুটো চোখ–এক আশ্চর্য আলোয় ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্বত্তা। যেই চোখের দিকে তাকালে স্বপ্ন দেখার সাহস বেড়ে যায়। এ বছর শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অসংখ্য বই লেখা হচ্ছে। কিছু কিছু বইয়ের প্রচ্ছদ আমাকেও আঁকতে হচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই শেখ মুজিবের প্রতিকৃতিকে বইয়ের প্রচ্ছদের জন্যে নানা ভাবে নির্মাণ করতে করতে ঐ আশ্চর্য স্বপ্নমাখা মহানায়কের মুখের সাথে নিবিড়তা বাড়ছে।

ক্রমশ স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাওয়া আপোষকামী মানুষের ভিড়ে পিলসুজে বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে আমার একান্ত শেখ মুজিব–মহাকালের অনন্ত প্রদীপ।■

● লেখক : চিত্রশিল্পী, কবি

দারিদ্র্য বিমোচন ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন

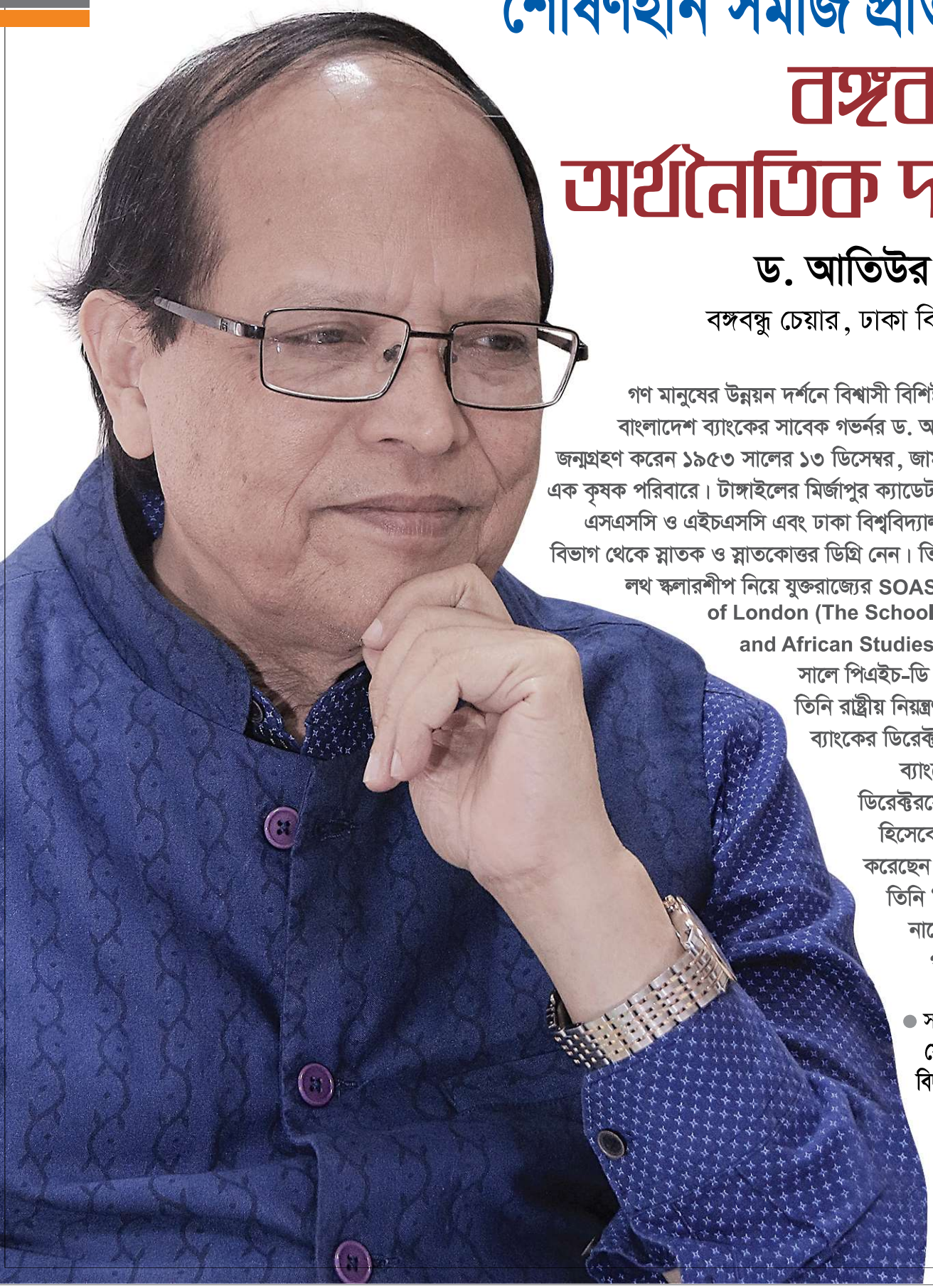

ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণ মানুষের উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর, জামালপুর জেলার এক কৃষক পরিবারে। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন। তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের SOAS University of London (The School of Oriental and African Studies) থেকে ১৯৭৭ সালে পিএইচ-ডি অর্জন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন সোনালী ব্যাংকের ডিরেক্টর এবং জনতা ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি 'উন্নয়ন সমন্বয়' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন।

● সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
ফেরদৌস সালাম
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রত্যয় : আপনি দেশখ্যাত একজন অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। আপনি জানেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক একটা দর্শন কাজ করেছে– সে বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি–

ড. আতিউর রহমান : এটা ঠিক যে বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে বঙ্গবন্ধুর একটা অর্থনৈতিক দর্শন কাজ করেছে। এই দর্শন তার নিজের জীবন থেকে নেয়া। তিনি যখন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই তার আশেপাশের সাধারণ মানুষের জীবন যাপন পর্যবেক্ষণ করতেন, তাদের সাথে মিশতেন। তারপর তিনি যখন মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার জন্য গোপালগঞ্জ শহরে গেলেন সেখানেও তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিশতেন। তাদের অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা জেনে নিতেন। অর্থাৎ তার মধ্যে মানুষের জীবন-যাপন তাদের সমস্যা দুরাবস্থার বিষয় নাড়া দিত। এমনও শোনা যায়, তাদের গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্য তিনি তার বাবাকে বলতেন, ওদের ঘরে খাবার নেই, তুমি তোমার গোলা থেকে কিছু ধান দিয়ে দাও ওরা বাঁচুক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটা লেখা থেকে জানলাম, বঙ্গবন্ধু তাঁর গরিব বন্ধুদের প্রতি এতোটাই সদয় ছিলেন যে, বৃষ্টি বাদলের দিনে তিনি তার ছাতা দিয়ে দিতেন; এজন্য বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতা তার জন্য বাড়তি ছাতা কিনে রাখতেন। কখনো কখনো শীতের মধ্যে গরিব বন্ধুকে গায়ের চাদর দিয়ে দিতেন। এই বাস্তব অবস্থা থেকেই তিনি উপলব্ধি করতেন এদেশের অনেক মানুষ অভাবে জর্জরিত, ঘরে খাবার নেই, পরনের কাপড় ঠিকমতো কিনতে পারে না।

তারপর তিনি যখন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে পড়তেন তার শিক্ষক আব্দুল হামিদ এর সাথে মুসলিম সেবা সমিতি করতেন। তিনি এই শিক্ষকের বাড়িতেই থাকতেন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন তিনি তার শিক্ষকের সাথে এলাকার অবস্থাসম্পন্ন ধনীদের বাড়ি থেকে মুষ্টি চাল উঠাতেন। সেই মুষ্টি চাল বিক্রি করে দুঃস্থ গরিব মুসলিম ছাত্রদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করতেন। হামিদ সাহেব মারা যাবার পর অন্য একজন শিক্ষককে সভাপতি করে তিনি এই কাজ চালিয়ে গেছেন। এ থেকে দেখা যায় ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন গরিবের কল্যাণকারী।

এরপর তিনি কলকাতায় কলেজে ভর্তি হন এবং রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। এই রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যান। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি লঙ্গরখানা পরিচালনাসহ অসহায় নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে পড়াশোনা পর্যন্ত ছেড়ে দেন। ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি ছিল– ভাত নয়, ফ্যান চাই। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন– সে সময় কলকাতার রাস্তায় না খেয়ে শত শত মানুষ মরে পড়ে থেকেছে– শুধু লাশ আর লাশ। সেসব বিষয় তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। মানুষের অভাব অভিযোগ দারিদ্র্যের বিষয় তাকে অন্যের কাছ থেকে শুনে বুঝতে হয়নি। নিজের চোখেই দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন। এই খাদ্য সংকট কেন হয়েছিল তাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে, বৃটিশদের যুদ্ধ নীতি এবং কিছু অপরিণামদর্শী নীতি ও সিদ্ধান্তের ফলে এই দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই কথাগুলো বলার কারণ, বঙ্গবন্ধুর সকল কিছু ঘিরেই ছিল মানুষের অর্থনীতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থা।

এরপর তিনি কলকাতা থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে ভর্তি হলেন। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তাদের চাকরি স্থায়ী ও বেতন বাড়ানোর আন্দোলন করছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাদের সেই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে যুক্ত হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি সেভাবে নেয়নি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কথা বলেছেন। আন্দোলন করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেকের চাকরি খেয়ে ফেলে। তিনি ভিসি মহোদয়কে বললেন, চাকরিচ্যুতদের চাকরিতে ফেরত নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভিসি একটা সময় বেঁধে দিলেন যোগদানের জন্য। কিন্তু সময়টা এতো কম দিলেন যে দূরের লোকদের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। তিনি তাদের ব্যাপারে আবার আন্দোলন করলেন। সে সময় এই অপরাধে তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকারী বন্ধুদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। অনেকে ক্ষমা চেয়ে থেকে গেলেও তিনি আর ক্ষমা চাইলেন না। তিনি বললেন, আমি ন্যায়ের পথে ছিলাম, আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে ন্যায়টা কি? ন্যায়টা হচেছ মানুষের প্রতি সুবিচার এবং তার বাঁচার জন্য ন্যূনতম অর্থের ব্যবস্থা করে দেয়া। তিনি সেটাই চেয়েছিলেন।

এরপর তিনি ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত

হলেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ গ্রেফতার হলেন। এটি শুধু ভাষার জন্য আন্দোলন ছিল না। এটি ছিল আর্থ-সামাজিক আন্দোলন। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের মুহূর্তে মানুষ যুক্ত হয়েছিল একটি আশায় যে তাদের ভাত-কাপড়ের চাহিদা পূরণ হবে। শিক্ষিত বেকাররা চাকরি পাবে, জীবন যাত্রার মান বাড়বে, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি হবে, অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটবে কিন্তু তাদের আশাভঙ্গ ঘটে।

বৃহত্তর সিলেটকে পাকিস্তানের অংশ করার জন্য সেখানে যে গণভোট হয়েছিল তাদেরকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তারা তুলে ধরেছেন স্বাধীন দেশে মানুষের ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটবে; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন, যে পাকিস্তান তারা পেয়েছেন সেই পাকিস্তান গরিবদের কথা বলে না। অর্থাৎ তারা তাদের আকাঙ্ক্ষার পাকিস্তান পাননি। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ হচ্ছে না। এ বিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুকে ক্ষুব্ধ করে তুললো। তিনি আবার ছাত্রদের সংগঠিত করা শুরু করলেন। প্রথমে ছাত্রলীগ করলেন। এরপর আওয়ামী মুসলিম লীগ করার জন্য সারা বাংলা ঘুরে বেড়ালেন এবং মুসলিম লীগ সরকারের অমানবিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণের কথা তুলে ধরলেন। তার সে সময়কার কথা এখন বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

গোয়েন্দারা লিখছেন একজন ইয়ং নেতা নাম শেখ মুজিব–তিনি সর্বত্র সরকারের সমালোচনা করছেন, তিনি বলছেন ক্ষতিপূরণবিহীন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কথা ছিল তা নিয়ে সরকার টালবাহানা করছে। দেশে খাদ্য সংকট চলছে–তা কেনো সরকার স্বীকার করছে না। শিক্ষা সংকটের কথা জেনেও তা সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে না।

কুমিল্লা-ঢাকা-ফরিদপুরের অনেক মৌসুমী কৃষি শ্রমিক খুলনায় ধান কাটতে যায়। ধান কাটা শেষ হলে তারা পারিশ্রমিক বাবদ ফসলের একটা অংশ নিয়ে বাড়ি ফেরে। কিন্তু খাদ্য সংকট চলায় সরকার 'কর্ডন প্রথা' চালু করে। এতে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য সামগ্রী নেয়া বন্ধ রাখা হয়। এ অবস্থায় শ্রমিকরা ভীষণ বিপদে পড়ে যায়। তিনি এ নিয়েও আন্দোলন করেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রায় ৩০০ কৃষি শ্রমিক, যাদের 'দাওয়াল' বলা হতো তাদের নিয়ে খুলনা জেলা প্রশাসকের নিকট যান এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানান। অন্যথায় তিনি আন্দোলনের হুমকি দেন। তাঁর জীবনের এসব ঘটনাবলীতেই একথা স্পষ্ট যে সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর যে দরদ-ভালোবাসা সেটিই ছিল তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা।

৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর তিনি কৃষি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন। সেখানে তিনি মাত্র অল্প কিছুদিন দায়িত্বে ছিলেন। এর মধ্যেই তিনি সমবায় মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ নিতে সক্ষম হন এবং কৃষকদের জন্য কি কি করা যায় তার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে এ কে ফজলুল হকের সরকার ভেঙে দেয়ায় তা আর বাস্তবায়ন করতে পারলেন না। মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়ার পর তাকে জেলে যেতে হলো। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবার দেশব্যাপী দল গোছানো শুরু করলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন। তিনি অনুভব করলেন পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক যে অবস্থা তাতে এখানকার মানুষের উদ্যোক্তা হবার সুযোগ খুব কম। কারণ, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প নিয়ন্ত্রণের একটা আইন ছিল, শিল্প বাণিজ্যের যে কোনো লাইসেন্স ইস্যু হতো করাচি থেকে, সেখান থেকে বাংলার অনেক উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষেই লাইসেন্স করা সম্ভব ছিল না। তিনি আরেকটি বিষয় অনুভব করলেন, দু'টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত এই দেশের মাঝখানে প্রায় ১৫০০ মাইল ফারাক। এই দুই অঞ্চলের একটি অর্থনীতি হতে পারে না। কৃষি, শিল্প, উৎপাদন বিবেচনা

করে দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক অর্থনীতি প্রয়োজন। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রয়োজন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং জাতীয়করণের কথা বলেছেন, কৃষকদের জন্য তিনি ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফের কথা বলেছেন। কৃষির আধুনিকায়নের কথা বলেছেন– এসব তিনি বলেছেন যখন মন্ত্রী ছিলেন না, গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

তিনি আমাদের দেশের নিরাপত্তার জন্য প্যারা মিলিটারি ফোর্সের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, যে দেশের শ্রমিক কর্মচারিদের বেতন ১০/১২ টাকার বেশি নয়, সেখানে ৬ হাজার টাকা বেতন দিয়ে গভর্নর রাখার কোনো যুক্তি নেই। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই শুধু নয়, মন্ত্রী হিসেবেও তিনি মূল্যায়ন করেছেন পূর্ব বাংলার মানুষকে কিভাবে শোষণ করা হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, পূর্ব বাংলার মানুষের যে সক্ষমতা, তা দিয়েই সোনার বাংলা গড়ে তোলা যায়। দেশের জনগণের জন্য শোষণমুক্ত অর্থনীতি এবং যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা যায় তিনি তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেটাই চেয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন গণতান্ত্রিক নেতা। তিনি শোষণমুক্ত অর্থনীতি চেয়েছেন কিন্তু জোর করে তা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন নি।

তাঁর ৬ দফার মধ্যে তিনি এসব বিষয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুই রকম কারেন্সির কথা। দুই অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা সেন্ট্রাল ব্যাংক হবে। ট্যাক্সের টাকায় কেন্দ্রীয় সরকার শুধু ফরেন অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় নির্বাহ করবে। বাকী অর্থ দুই অঞ্চলের প্রাদেশিক সরকার খরচ করবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে যার যার অঞ্চলেই লাইসেন্স প্রদানের সুবিধা থাকবে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার প্রয়োজন হবে না, এখানেই লাইসেন্স করার ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য প্যারা মিলিটারি থাকতে হবে। এ সবই তার ৬ দফার মধ্যে ছিল। এই ৬ দফা নিয়ে যখন তিনি আন্দোলন করছেন, তখন আরো গভীরভাবে অর্থনীতি ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভেবেছেন। আন্দোলন করার দায়ে তাকে যখন জেলে নেয়া হলো তখন তিনি জেলে বসেই পাকিস্তানের বাজেট পর্যালোচনা করছেন। শোয়েব তখন অর্থমন্ত্রী, তারা কিভাবে পূর্ব বাংলাকে ঠকাচ্ছেন– কিভাবে শোষণ করা হচ্ছে তা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব জেলে বসে লিখছেন।

প্রত্যয় : ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় এ দেশের মানুষের, বিশেষ করে কৃষি প্রধান পূর্ব বাংলার কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন– এ ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি।

ড. আতিউর রহমান : তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ নেতা। তাঁর সকল বক্তৃতাতেই সাধারণ মানুষের কথা থাকতো। তবে তার অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তার যে প্রতিফলন তা লক্ষ্য করি ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন সেই বক্তৃতায়। তিনি কৃষকদের জন্য ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা মওকুফের কথা বলেছেন, জমি সীমার মধ্যে ১০০ বিঘা পর্যন্ত রাখার কথা বলেছেন। প্রাইমারী শিক্ষাকে অবৈতনিক ও জাতীয়করণ করার কথা বলেছেন, কৃষির আধুনিকায়নের কথা বলেছেন। সবাইকে বিদ্যুৎ দেয়ার কথা বলেছেন– এ থেকেই বুঝা যায় সাধারণ মানুষের কল্যাণই ছিল তার অর্থনীতির মূল দর্শন।

প্রত্যয় : বঙ্গবন্ধু কোন প্রেক্ষাপটে জাতীয়করণ করেন বলে আপনি মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান : বঙ্গবন্ধু সবার উর্ধ্বে সাধারণ মানুষের শাসন শোষণমুক্ত সমাজ চেয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি সংবিধানে ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমতাভিত্তিক অর্থনীতি বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা তুলে

ধরেছেন। তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন কিন্তু তার সমাজতন্ত্র ছিল মূলত অর্থনৈতিক মুক্তির। তিনি সেখানে পাবলিক সেক্টরের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরের কথাও বলেছেন, তাদের উন্নয়নের কথা বলেছেন। তিনি সমবায়কেও গ্রহণ করেছেন। সমবায়কে যুগোপযোগী করার কথা বলেছেন। তিনি জাতীয়করণের যে ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমতা আনা। এছাড়া সে সময় সকল বড় বড় শিল্প কারখানা অরক্ষিত ছিল– এগুলো চালাবে কে? পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্প ব্যবসায়ীরা এসব ছেড়ে চলে গেছে। এগুলো চালাতে জাতীয়করণ নীতি ছাড়া সরকারের আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি সে কাজটিই করেছেন। প্রথম দু'বছর জাতীয়করণ খুব ভালো চলেছে। পরবর্তীকালে এগুলো পড়তে শুরু করে। এর কারণ হলো তাদের শিল্প কারখানা চালানোর অভিজ্ঞতাই ছিল না।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখি স্বাধীনতার পর জাতীয়করণ নীতির আওতায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে একসময় বিনিয়োগের আপার সিলিং ছিলো ২৫ লাখ টাকা। ১৯৭৪/৭৫ সালে তিনি এক ধাক্কায় তা ৩ কোটি টাকা করে দিলেন। ১০০টিরও বেশি কোম্পানি-শিল্প কারখানা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যা সরকার জাতীয়করণ করেছিল। তিনি কখনোই প্রাইভেট সেক্টরের বিরোধী ছিলেন না।

১৯৫২ সালে তিনি যখন চীন সফর করেন তখন তিনি চীনের সমাজতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিন্তু একটা জিনিস তিনি আমাদের বুঝিয়েছেন যে, তার গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র যে আলাদা তিনি 'নয়াচীনের' উপর লেখা বইয়ে তা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, ভাত-কাপড় পাবার ও আদায় করে নেয়ার অধিকার মানুষের থাকবে এবং সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবনবোধ পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়। তিনি চীনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রশংসা করেছেন, তিনি চীনের কো-অপারেটিভ দেখতে যাচ্ছেন, তিনি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকারখানা দেখতে যাচ্ছেন। যখন তারা বঙ্গবন্ধুকে পুরনো স্থাপত্য– কলকারখানা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তিনি বলছেন, আমি তো পুরনো কিছু দেখতে আসিনি। আমি তোমাদের নয়াচীন দেখতে এসেছি। দেখতে এসেছি তোমরা শিল্প কারখানার পরিকল্পনা কেমন করে করছো, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন, সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন কেমন করে করছো সে সব দেখতে এসেছি।

তিনি একটা বড় কাপড়ের মিল দেখতে গিয়ে দেখলেন তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন ব্যক্তিখাতের মানুষ। তাকে যখন তিনি বললেন, এটি তো জাতীয়করণ করা হয়েছে, আপনি কিভাবে চালাচ্ছেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমি এর পুরনো মালিক, আমার মিল চালানোর অভিজ্ঞতা আছে বলেই এটি চালানোর ভার আমাকে দেয়া হয়েছে।

নয়াচীন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর লেখা বইটি পড়ে বুঝা যায়, ৫২ সালে যার বয়স ৩২ বছর, সে সময়ই তিনি একজন দূরদর্শী নেতা হতে যাচ্ছেন– তিনি যদি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারেন তাহলে কি পরিকল্পনা করবেন, কিভাবে নিজের দেশের উন্নয়ন করতে পারবেন তা জানার জন্যে চেষ্টা করেছেন। এখান থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন।

প্রত্যয় : ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। এর মূল উদ্দেশ্য কি ছিল বলে আপনার মূল্যায়ন? ৭৪ এর দুর্ভিক্ষের পেছনে কি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ছিল?

ড. আতিউর রহমান : আমি মনে করি, তার কল্যাণ অর্থনীতির বড় প্রয়োগ হয়েছে ১৯৭৫ সালে যখন তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলেন। তার রাজনৈতিক দিক বাদ দিয়ে আমরা যদি তার অর্থনৈতিক দিকটি মূল্যায়ন করি তাহলে কিন্তু অবাক হয়ে যাই যে, তিনি অর্থনীতিতে বিকেন্দ্রীকরণ আনতে চেয়েছিলেন। একটা জেলাতে গভর্নর নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছেন–গভর্নরদেরকে তিনি বলেছেন এতো বড় দেশ, আমি উপর থেকে দুর্নীতি দূর করতে পারব না। তোমরা ছোট একটা এলাকা শাসন করবে, তোমরা ঠিকই তা পারবে। আমি চাই তোমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করবে। এরপর বলেছেন, আমি একটা অবশ্যকরণীয় কো-অপারেটিভ করতে চাই। তবে এর অর্থ এই নয় জোর করে জমি দখল করে মালিকানা কেড়ে নেয়া হবে– জমির মালিকদের একটা ভাগ থাকবে, যারা চাষ করবে তাদের একটা এবং শ্রমিকদের একটা ভাগ থাকবে। আমরা কৃষিতে এরকম একটা সমবায় করে কৃষি খাতের উৎপাদন বাড়াতে চাই। অব্যবহৃত জমি কৃষির আওতায় আনতে চাই। আমি গবেষণা করে দেখেছি যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমবায় পছন্দ করতেন এবং বঙ্গবন্ধুও সমবায় পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা পছন্দ করতেন, এর উন্নয়ন চাইতেন; বঙ্গবন্ধুও তা চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নয়নের প্রশংসা করলেও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে না পারার সমালোচনা করেছেন, বলেছেন এতে করে মানুষের মৌলিক চেতনা, মননশীলতা হারিয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুও ঠিক এ কথাই বলেছেন। এই যে দু'জনের অনুভব তা কিন্তু একই আঙ্গিকের।

অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বাকশাল গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি কিন্তু বলেছেন– এটা সাময়িক পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। আমি প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থায় গিয়েছি। আমি দ্রুতই রাজনৈতিক কারণে এই ব্যবস্থা তুলে নেবো যাতে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়।

আমরা দেখেছি, ৭৫ সালে তিনি কৃষির জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার সুফল কিন্তু ফলতে শুরু করেছিলো। '৭৪ এর দুর্ভিক্ষ কিন্তু হয়েছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। সে সময় ব্যাপক ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি তা উপলব্ধি করে খাদ্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তিনি সে সময় কোথাও থেকে চাল সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। দুর্ভিক্ষ মুহূর্তে কথা দিয়েও আমাদের দেশের জন্য প্রেরিত পিএল ৪৮০ চাল ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কিসিঞ্জার এবং তা দিয়ে দিলো ইন্দোনেশিয়াকে। আমরা সামান্য পাট বিক্রি করেছি কিউবাতে, সেই অযুহাতে আমেরিকা এই হীন কাজটি করে। আর রাশিয়ার নিকট থেকে আমাদের খাদ্য পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে, তাও পর্যাপ্ত নয়। ভারতও আমাদের খাদ্য সহযোগিতা দিতে পারেনি। এরকম একটা নাজুক অবস্থায় বঙ্গবন্ধুকে দেশ পরিচালনা করতে হয়েছে।

প্রত্যয় : শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা নিয়ে কিছু বলুন।

ড. আতিউর রহমান : সাড়ে তিন বছরে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভাঙা অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, সে সময় বাংলাদেশের পুরো অর্থনীতি ছিল ৮ মিলিয়ন ডলারের। মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭/৪৮ বছর। রাস্তা-ঘাট ছিল না, সকল বন্দরে ছিল মাইন পোতা, ব্রীজগুলো ভাঙা, স্কুল-কলেজ ভাঙা, ১ কোটি মানুষ গৃহচ্যুত, তাদের নতুন করে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হয়েছে। হাজার হাজার, লাখ লাখ ইজ্জত হারানো মা-বোনদের পুনর্বাসন করতে হচ্ছে। এমনিতরো অবস্থার মধ্যেও তিনি ড. কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন করেছেন– প্রফেসর কবীর চৌধুরীকে শিক্ষা সচিব করেছেন। তিনি একজন সুদূর প্রসারী মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন নেতা ছিলেন এবং তার অর্থনীতি ছিল মূলত মানবিকতা এবং মানুষের জন্য উন্নয়ন। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষার উন্নয়নের বিকল্প নেই। তিনি চেয়েছেন এ দেশের মানুষ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। কারিগড়ি শিক্ষার প্রতি তিনি জোর দিয়েছিলেন। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য তার এই যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন তা ৭৫ সালে বিনষ্ট করা হলো। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, বৃটিশ আমলে মুর্শিদাবাদের একজন ব্যবসায়ীর যে সম্পদ ছিল পুরো লন্ডনের অর্থনীতিতে তা ছিল না– সেই

অর্থনীতি আজ কোথায়? তিনি সেই গৌরব গাথায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন সুখী সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ গড়ে তুলতে।

প্রত্যয় : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এক বিশাল স্বপ্ন দেখেছেন। বর্তমানে তার আদর্শের সরকার ক্ষমতায়। আপনার দৃষ্টিতে তার সেই বাস্তবায়ন কতোটা সম্ভব হয়েছে?

ড. আতিউর রহমান : আমার মূল্যায়ন হচ্ছে গত ৪০ বছরে বাংলাদেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ৭২ সালে ৯০ ভাগ মানুষ গরিব ও দরিদ্র ছিল এই বাংলাদেশে। সেখান থেকে আজকে এই হার ১২ শতাংশে নামানো গেছে। এটা কম কথা নয়। না খেয়ে এখন আর কেউ ঘুমায় না এই বাংলায়। আমাদের ১০০% ছেলে মেয়ে স্কুলে যায়। আমাদের মেয়েরা এখন কম বয়সে বিয়ে করতে চায় না এবং বাবা মা অভিভাবকরাও অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে চান না।

বঙ্গবন্ধুর সেই যে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে এগুচ্ছে। তবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাথে এই সরকারের কিছুটা তফাৎ আমরা লক্ষ্য করছি– সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সে সময়ে ২২ পুঁজিপতি পরিবারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন কিন্তু আজকের বাংলাদেশে শত শত, হাজার হাজার সেরকম পরিবার গড়ে উঠেছে। এই অতি ধনীদের খপ্পরে পড়েছে আমাদের অর্থনীতি। এই অতি ধনীদের কারণেই দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। তবে এই বৈষম্য বাড়লেও মানুষ খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি, মৎস্য এবং সবজিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি। বিচক্ষণ নীতি নেয়ার কারণে সারা বিশ্বে ইলিশে আমরা এক নম্বর। বিশ্বের ৮৬% ইলিশই আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়। নিচের দিকের মানুষেরও পরিবর্তন আসছে। উপরের দিকের অতি ধনী কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে যদি আমি বৈষম্য পরিমাপ করি তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু তেমন বৈষম্য নেই।

প্রত্যয় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড় স্বপ্ন ছিল স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্যতা দূরীকরণ। সে লক্ষ্য অর্জনে শুরু থেকেই তিনি যে উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, আজকের বাস্তবতায় তার প্রতিফলন এবং এ জন্যে আর কি কি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ড. আতিউর রহমান : বঙ্গবন্ধু যখন কাজ শুরু করেছেন তখন সরকারের ততোটা সামর্থ্য ছিল না। তখন ছিলো চ্যালেঞ্জিং একটা সময়, সে রকম একটা সময়ে যারা উদ্যোক্তা বঙ্গবন্ধু তাদের কাজ করার সুযোগ দিলেন। এই যে 'ব্র্যাক', তখনই কিন্তু সৃষ্টি হয়। গণস্বাস্থ্য কিন্তু তখনই তৈরি হয়। প্রথমে এসব সংস্থা 'রিলিফ' এর কাজ করতো, এরপর তাদের ডেভেলপমেন্টে আসার সুযোগ করে দিলেন তিনি। তখন কম খরচে উন্নয়নের এই সুযোগ করে দিলেন। পরবর্তী সরকারগুলোও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে– এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান সরকার সেই কর্মধারাকে আরো বেশি করে সমর্থন করছে।

শুরুতে বঙ্গবন্ধুর সরকার যে সুযোগ করে দিয়েছিল তার ফলেই কম খরচে উন্নয়নের কিছু সমাধান আমাদের দেশে এসেছে। সেই সমাধানে সরকার নীতিমালার সুযোগ করে দিয়েছে। ব্যক্তিখাত তার দায়বদ্ধতার মাধ্যমে স্কুল, কলেজ আরো নানা কিছু তৈরি করেছে এবং এনজিওরা গ্রামেগঞ্জে সামাজিক দায়বদ্ধতার অনেক কাজ করেছে। তাদের বড় একটা কাজ হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ। তাদের মাধ্যমে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ ক্ষুদ্রঋণের একাউন্ট হয়েছে। আর ক্ষুদ্রঋণ এখন আর ক্ষুদ্রঋণ নেই। এটাকে এসএমই পর্যায়ে নিয়ে গেছে, এখন তাদের অনেকেই ১০ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং এনজিওরা তাদের তা দিচ্ছেও। আমি মনে করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল পাটাতনটা এই এনজিওরাই করে দিয়েছে এবং এই সুযোগ বঙ্গবন্ধুই করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করা যায় তাহলে অসাধ্য সাধণ করা সম্ভব।

আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালীন এসব এমএফআই-এর সাথে কাজ করেছি। সে সময় থেকে কৃষি ঋণের এক তৃতীয়াংশই এনজিও এবং ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে লিঙ্কেজ প্রোগ্রামে কৃষকদের কাছে যাচ্ছে। বর্গাচাষীদের জন্য আমি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সরাসরি এনজিওদের সাথে কাজ করেছি। সুতরাং আমরা সবাই মিলেই

উন্নয়ন করছি এবং এটি বঙ্গবন্ধুর সেই সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন দর্শন থেকেই এসেছে।

আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন যে, দেশের মানুষের ভাগ্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। আপনি যদি কোনো একজন রিকসাচালক বা তার স্ত্রীকে বলেন মেয়েটা বড় হয়েছে, বিয়ের ব্যবস্থা নিন– সে জবাব দেবে, আগে বিএ পাস করুক তারপর ভাববো। এই যে চাহিদা তৈরি হয়েছে, উন্নয়ন ঘটেছে এটা সরকার একা পারেনি, আমরা সবাই মিলেই করতে পেরেছি।

প্রত্যয় : দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বাড়ছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর অবদান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

ড. আতিউর রহমান : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী এবং পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধায় বিশ্বাস করতেন। আমাদের সংবিধানেও তা উল্লেখ রয়েছে। তার এই সুদূরপ্রসারী চিন্তার আলোকে নারীরা আজ শিক্ষায় এগিয়ে এসেছে। তারা এখন অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি, নারীর ক্ষমতায়নে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই এখন অধিক সংখ্যায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এর পেছনে সরকারের উদ্যোগ ও দায়িত্ব পালনই বেশি ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করছেন। মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করছেন, মায়ের হাসি প্রকল্প নিয়েছেন এবং এনজিওদের সাথে যৌথ উদ্যোগে কিশোরীদের জন্য প্রোগ্রাম করছেন। এনজিওরা এগিয়ে এসেছে, বিশেষ করে উন্নত মানের খামার স্থাপন, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর খামার, মাছের খামার, নিরাপদ খাবার উৎপাদন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদি নানা উন্নয়ন উদ্যোগে স্বল্প ব্যয়ের সমাধান বাংলাদেশ করতে পেরেছে বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছর হয়েছে, যা আমাদের প্রতিবেশি দেশের চেয়েও ৪/৫ বছর বেশি। মাথাপিছু আয়ও নিয়মিত বাড়ছে।

আমি একথা দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, এই উন্নয়নের পেছনে বঙ্গবন্ধুর অবদান বিশাল। তিনি সংবিধানে জোর দিয়েছিলেন যে নারীতে পুরুষে বৈষম্য থাকবে না, শহরে-গ্রামে বৈষম্য কমিয়ে ফেলা হবে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য থাকবে না। এই জোরটা তিনি তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই দিয়েছিলেন।

তার যোগ্য উত্তরসুরী আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও সেই পথ ধরেই ঘোষণা দিয়েছেন গ্রাম আর পিছিয়ে থাকবে না, গ্রামগুলো শহরে পরিণত হবে। গ্রামের ঘরে ঘরে তিনি বিদ্যুৎ দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন– এটা একটা পরম্পরা। যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বঙ্গবন্ধু বলতেন সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কন্যার হাত ধরে চলছে। তবে আমি এও বলবো, নারীর ক্ষমতায়নে এনজিওদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছেন এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যয় : বর্তমান সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি বড় বাধা। আপনি কি বলেন?

ড. আতিউর রহমান : এটা ঠিকই বলেছেন। এটি সত্যিই বড় বাধা। এটা বঙ্গবন্ধুর সময়েও ছিল, এখনো আছে। আমি বলবো, ১ নম্বর চ্যালেঞ্জ হলো শাসন ব্যবস্থায় এখনো প্রচুর দুর্নীতি আছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি এখনো বিরাজমান যা আগেও ছিল। বঙ্গবন্ধুও সে সময়টিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দারুণ সোচ্চার ছিলেন, আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে। যে কোনো মূল্যেই দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি তার সংখ্যা বেড়েছে, তবে এই শিক্ষাকে আরো উন্নত মানের করতে হবে। আরো কারিগরি ও ডিজিটালি দক্ষ করে তুলতে হবে। এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে হবে। তৃতীয়ত : শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের কর্মসংস্থান শুধু সরকারি চাকরি দিয়ে হবে না, বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত ও এনজিওদের নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির কাজ কিন্তু ইতোমধ্যেই এনজিওরা করে যাচ্ছে– সেই কাজকে আরো সমর্থন দিতে হবে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা বাড়াতে পারলে দেশটা আরো এগিয়ে যাবে।

প্রত্যয় : দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি নিজেও বলেছেন এর পেছনে সরকারের পাশাপাশি এনজিওরাও ভূমিকা রাখছে। দেশকে আরো এগিয়ে নিতে অনেকেই কারিগরি শিক্ষার প্রতি জোর দিচ্ছে– এনজিওরা এক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখতে পারে? আপনার প্রস্তাবনা কি?

ড. আতিউর রহমান : এনজিওরা সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে পারে যে, গ্রামে আমরা নারীদের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবো। এতে যেমন নারীদের কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটবে, সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি এনজিওদের ব্যবসারও সুযোগ ঘটবে এবং ছেলেদের জন্যেও এটা করা যেতে পারে। এতে অনেক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। এই উদ্যোক্তা আবার কর্মীও তৈরি করবে। এনজিওদের এগিয়ে আসার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে আমি মনে করি।

প্রত্যয় : অনেকেই মনে করেন, বর্তমান সরকার এনজিওদের কার্যক্রমের সমালোচনা করে তাদের উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

ড. আতিউর রহমান : আমি তা মনে করি না। এখন কাউকে কিছু বলতে শুনি না। এনজিওদের কাজ স্বাভাবিকভাবেই করতে দিচ্ছে। বরং সরকার এনজিওদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনার জন্য বেশ কিছু নীতি নির্ধারণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণের জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) প্রতিষ্ঠা করেছে। এমআরএ করাটা সরকারের একটি ভালো কাজ। কারণ, মাঠে রেফারি প্রয়োজন। রেফারি ছাড়া খেলা হয় শৃঙ্খলাহীন, যার যার ইচ্ছে মতো। শৃঙ্খলার সাথে খেলার জন্যই রেফারি দরকার। তা না হলে মাঠে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করেই এমআরএ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি একটি ইতিবাচক দিক বলে আমি মনে করি। এনজিওদেরও ভাবতে হবে দেশে একটি সার্বভৌম সরকার আছে। সরকার দেশের উন্নয়নের সাথে যেরকম কার্যক্রম চান তার বাস্তবায়নে এনজিওদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। দুইয়ে মিলেই হবে আমাদের উন্নতি।

প্রত্যয় : বর্তমান বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছর। আপনি উদযাপন কমিটির সাথে সম্পৃক্ত। আপনি একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। আপনার কোনো প্রস্তাবনা আছে কি?

ড. আতিউর রহমান : আপনারা জানেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী শুধু উৎসবের মধ্যে পালন নয়–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারীর জন্য এর সকল আনুষ্ঠানিকতা বাতিল করেছেন। কারণ, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী মূলত পালনের কোনো বিষয় নয়। তাঁর আদর্শকে ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী দেশের উন্নয়নই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। আমরা শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে এনজিওদের একটি ম্যাসেজ দিতে চাই যে, এখন যে ১০-১১% মানুষ হতদরিদ্র আছে, আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই হার ৪-৫% এ নামিয়ে আনি। সব দেশেই এ পরিমাণ হত দরিদ্র আছে এবং থাকবে। তাদের আমরা সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে বেঁচে থাকার উদ্যোগ নেবো। ১০% কে আমরা ৫% এ নামিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

গ্রামে যে মানুষটি এখনো কুঁড়ে ঘরে আছে তাকে টিনের ঘর বা সেমি পাকা বিল্ডিং করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সন্তানরা বিদেশে আছে, যাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, সপ্তাহে সপ্তাহে একজন নার্স কিংবা ডাক্তার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তার ঘরে যাবেন সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। এই কাজ কি এনজিওরা করতে পারে না? যদি করতে পারে তবে এটাই হবে মুজিব জন্ম শতবার্ষিকীতে এনজিওদের পক্ষ থেকে বড় উপহার। আমি আশা করি, এ ব্যাপারে তারা এগিয়ে আসবেন ■

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের বাস্তবতা

জাফর ওয়াজেদ

শোষকের গণতন্ত্র নয়, চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র। আর এই চাওয়াকে কার্যকর করার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি রাজনীতি করেছেন দুঃখী বাঙালির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। দুঃখী মানুষকে ভালবেসে পরিশ্রম করেছেন শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। তাকে হত্যা করে সে সম্ভাবনা ধ্বংস করে দেয় ষড়যন্ত্রকারীরা। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তার প্রকৃত প্রারম্ভ দেখা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় বিপ্লবকে বিচার করতে হয় সময়ের প্রেক্ষাপটে তত্ত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে। এটা তো বাস্তব যে, দ্বিতীয় বিপ্লবের উৎস থেকে বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দাঁড় করাতে পারলেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের স্বরূপ চিহ্নিত করা যায়।

১৯৭৪ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সদর্পে উচ্চারণ করেছিলেন, 'বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের দলে।' তিনি তাই শোষিতের গণতন্ত্রের পক্ষে নিজের, দলের এবং দেশের অবস্থানকে দৃঢ় করেছিলেন। তার জীবনচরিত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাপক বাঙালি জনগণের স্বার্থ রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড অবিচল গতিতে এগিয়েছে সব সময়। ছয় দফার সংগ্রাম থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সম্পূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হয়েছে মেহনতী বাঙালি জনগণের স্বার্থে। বাঙালি মধ্যশ্রেণী বা ধনিক-বণিকের স্বার্থ যে বঙ্গবন্ধু রক্ষা করেননি, বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কর্মসূচি ও নীতিমালা পর্যালোচনা করলেই তার প্রমাণ মেলে।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিপ্লব ছিল স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে তিনি বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় বিপ্লব হলো, সেই স্বাধীন দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তি। ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাসী। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের বাস্তব প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে পুরাতন সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে হবে।' বঙ্গবন্ধুর এই অঙ্গীকারই স্পষ্ট করে, স্বাধীনতার ঊষালগ্ন হতেই তিনি তার লক্ষ্যের প্রতি কতটা স্থিরচিত্ত ছিলেন। তাই জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় চেতনার উপযোগী পর্যায়ক্রমিক সহজ পথ। বঙ্গবন্ধুর জানা ছিল, শুধু তত্ত্বের আক্ষরিক বিন্যাস বা সূত্রের বিধিবদ্ধ প্রণালী দিয়ে বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর দেশে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির গ্রহণযোগ্য পথ নির্ণয় করা যায় না। এখানে পুরাতন আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভাঙতে হলে একটা কর্মসূচিভিত্তিক ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এদেশের অতীত বামপন্থী আন্দোলন এই সহজ উপলব্ধি ধারণ করতে পেরেছিল, তা নয়। বঙ্গবন্ধুর এই মৌলিক উপলব্ধি বা বোধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জাগ্রত ছিল। যে কারণে ছয় দফার সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতার বিজয় পর্যন্ত তিনি হাজার বছরের জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে পেরেছেন। প্রমাণ করেছেন বাঙালির স্বার্থে স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে ভিন্ন কিছুই মানতে তিনি রাজি নন। নির্যাতন, ভয়, প্রলোভন কোনো কিছুই তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলেছেন, 'সাবেকি আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে ভাঙতে না পারলে জনগণের মুক্তি আসবে না।' তাই পর্যায়ক্রমিক প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি সে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই প্রগতির আন্দোলনে বিকশিত পর্যায়টি ছিল তার দ্বিতীয় বিপ্লব। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার চূড়ান্ত পদক্ষেপ 'শোষণহীন সোনার বাংলা' গড়ার মৌলিক কর্মসূচি। আবার, এক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজস্ব চেতনা ও অভিজ্ঞতা বর্জন করে প্রগতির নামে আকস্মিকভাবে কোন অবাস্তব তত্ত্বাশ্রয়ী নিয়ম চাপিয়ে দেননি। জননেত্রী শেখ হাসিনা তেত্রিশ বছর আগে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল বাঙালির জনগণের মুক্তির পথনির্দেশ। বঙ্গবন্ধুর শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি ছিল সুদূরপ্রসারী। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার আয়োজন ছিল তাঁর। তৃতীয় বিশ্বের জনগণের সামনেও বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্তি সংগ্রামের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, জনগণের চেতনা ও দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে যে নতুন দিকনির্দেশ দিয়েছেন, তা কোনো ছকে বাঁধা বা ধার করা পদ্ধতি ছিল না। গণতন্ত্রকে শোষিত মানুষের উপযোগী করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশের জনগণের সামনে যে কর্মসূচি তুলে ধরেছেন, তা ছিল বিশ্ব রাজনীতির এক নতুন

অধ্যায়।' ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'দ্বিতীয় বিপ্লব' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ হাসিনা স্পষ্ট করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও লক্ষ্য কোন পথে ধাবিত। বঙ্গবন্ধু কৃষক ও শ্রমিকঅন্তপ্রাণ। তাই তিনি বিদ্যমান পদ্ধতির পরিবর্তন করে কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত দলের নামকরণ করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল। দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানোই ছিল বাকশাল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। একটি পদ্ধতি হিসেবে বাকশালের লক্ষ্য ছিল এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। যে ব্যবস্থা শোষিত মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে। দ্বিতীয় বিপ্লবকে যারা কেবলই 'বাকশাল' বলে আখ্যায়িত করেছেন কিংবা এই কর্মসূচিকে তত্ত্ব বা সংজ্ঞায় চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন তারা শেখ হাসিনার বক্তব্যকে অনুধাবন করলে স্পষ্ট হতেন, তত্ত্ব-সূত্রের সনাতন বিশ্লেষণে এই কর্মসূচির মৌলিক গতিপ্রাণ বোঝা যাবে না। শেখ হাসিনার সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনার মধ্যেই 'বাকশাল' কর্মসূচি তথা দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব বাংলার মানুষের হৃদয়ে কী মরণপণ প্রতিজ্ঞার জন্ম দিয়েছিল সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত। ছয় দফার ভিত্তিতে তিনি জাতীয় জীবনের ঘটনাস্রোতকেই শুধু নিয়ন্ত্রণ করেননি, পুরো জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ছেষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত এক অভিনব স্বভাবনাপূর্ণ সময়ের জন্ম দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। জাতিসত্তায়, সমাজ ও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাঙালি তাঁর নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস সৃজন করেছে। বঙ্গবন্ধু 'শোষণহীন সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রেরণা ছিল এই নাম। তিনি যা করতে চেয়েছেন, তার মূল প্রেরণা ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে শোষণের অবসান ঘটিয়ে সোনার বাংলায় দেশকে রূপান্তরিত করা। নিজের দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্রষ্টা বা রূপকার যেভাবে নিজস্ব চেতনার পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন, বঙ্গবন্ধুও সেভাবেই তাঁর দেশ ও জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ পরিমণ্ডল গড়েছেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন অতীতের মতো স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও তার সকল কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সরকারি আদেশ জারি করে তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাননি। গ্রহণযোগ্য কর্মসূচির ভিত্তিতে তিনি জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের সাফল্য অর্জন করতে চেয়েছেন। এটা বাস্তব– যে জনগণের স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘকাল তিনি জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে সংগ্রাম করেছেন সেই জনগণকে মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতার পর একে একে সর্বজনগ্রাহ্য কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন সময় ও গণচেতনার উপযোগী করে, যার ভিত্তিতে সমগ্র জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে মূল লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু কলেজের জীবনে মার্কস এবং এঙ্গেলসের গ্রন্থাদি পাঠ করে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; এমনটি বলা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার বিশ্লেষকরা বলেছেন, সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে খেটেখাওয়া মানুষের অভাব, অনটন, শিক্ষা, চিকিৎসার অভাব ও অত্যাচারী শোষকের হৃদয়হীনতা নিজের চোখে দেখে এবং সরকারের বিভিন্ন সময় আপাত দৃষ্টিতে কল্যাণমুখী নীতিমালা ও কার্যক্রমের ব্যর্থতা লক্ষ্য করে অবশেষে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এ দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ব্যাপক জনগণের বাস্তব জীবন ছিল তার অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়েই তৈরি হয়েছে তাঁর পথ ও প্রক্রিয়া। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছেন ইতিহাসের রায়– বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের পথেই বাঙালিকে মুক্তি অর্জন করতে হবে। আদর্শের বিষয়ে আপোস করে রাজনীতি করতে তিনি নারাজ ছিলেন। সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে তাঁর ক্রিয়া-কর্মের নিবিড় যোগসূত্র ছিল বলেই এবং আদর্শের জন্য যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতে সবসময় প্রস্তুত ছিলেন বলেই তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল মূলত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়ে জনগণকে একটি সর্বাঙ্গীন প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার পদ্ধতি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এই দ্বিতীয় বিপ্লব একমাত্র জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সফল হতে পারত। পরিস্থিতি এমন ছিল না যে, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে আরও তীব্রতর করে তুলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যেখানে শোষিত জনগণ শাসক শ্রেণীর হাত নির্মূল করে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। বাস্তবে জনগণের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর গভীর পরিচয় ছিল বলেই তিনি জানতেন যে, শোষিত জনগণের রাজনৈতিক চেতনা আরও সমৃদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এবং তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতার বিকাশ লাভ না করা পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করার কর্মকাণ্ড গ্রহণ করলে দেশে নৈরাজ্যই সৃষ্টি হবে। শোষিত জনগণের মুক্তি আসবে না। বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল বিভিন্ন পদক্ষেপ ও দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল বিন্যাস ধারাটি এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হতে পারে। তিনি জনগণের চেতনার মান অক্ষুণ্ন রেখে পর্যায়ক্রমে পুরনো সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ার জন্য অর্থবহ কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। সমাজের সকল ক্ষেত্রে যাতে একটা পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয় এবং দ্রুত দরিদ্র শ্রেণীর কর্মসূচিগত ঐক্য ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে। তিনি শ্রেণীসংগ্রামের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে চাননি। জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক শ্রমিককে সংগঠিত করতে যেমনি সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি সরকারি ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অধনবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের পথে ধনিক-বণিক শ্রেণীর সম্পদ ও শ্রমের সকল মুনাফা একচেটিয়া ভোগের পথ বন্ধের ব্যবস্থা করেন। নতুন সমাজ বিনির্মাণের উপযোগী প্রশাসন, শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি মৌলিক ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের ধারা সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই মেহনতী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা নিশ্চিত করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মূল্যায়ন জরুরী। স্বল্প পরিসরে বিশ্লেষণ করা দুরূহ যদিও, তবু তার রেশ সামনে নিয়ে আসা জরুরি। এ নিয়ে আরও পর্যালোচনা, মূল্যায়ন প্রয়োজন। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হবে, বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি নিয়ে অযৌক্তিক নিন্দা-মন্দ, কটু সমালোচনার অন্তরালে মূলত অন্ত শূন্যতাই প্রকট ছিল। এই কর্মসূচি মূলত বাঙালির মুক্তি সনদই বলে প্রতীয়মান হয়।■

● লেখক : মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

১৯৭৪ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সামনে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু সদর্পে উচ্চারণ করেছিলেন, 'বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের দলে।' তিনি তাই শোষিতের গণতন্ত্রের পক্ষে নিজের, দলের এবং দেশের অবস্থানকে দৃঢ় করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর উদারতা আকাশের মত বিশাল

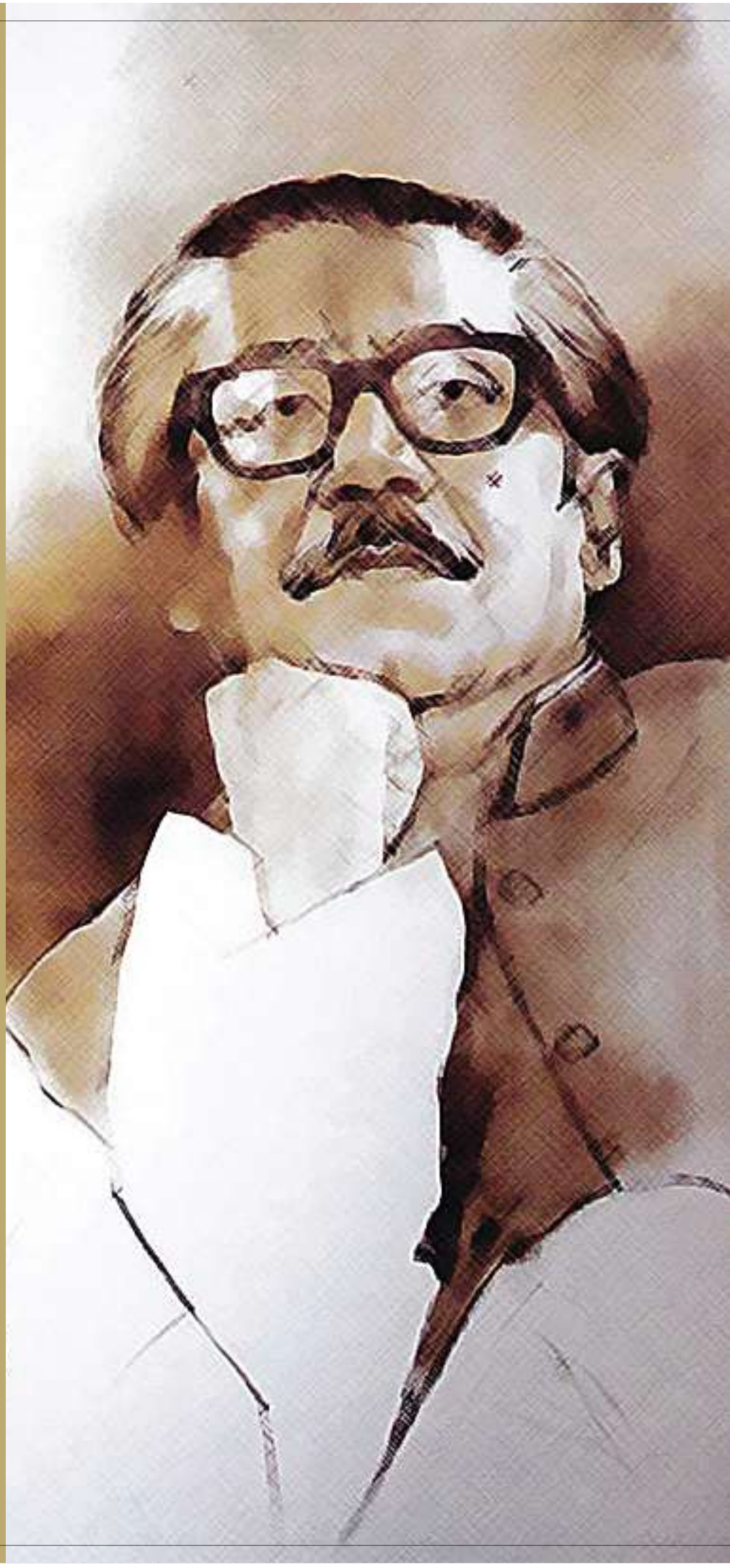

রফিকুল ইসলাম রতন

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দুই দিন পরের ঘটনা। বঙ্গবন্ধু এদিন পুরানো গণভবনে এবিএম মূসাকে দেখে বললেন, হ্যাঁ-রে, সবাইকে দেখলাম, বদরুদ্দিন ভাই কোথায়? বদরুদ্দিন মানে, তৎকালীন পাকিস্তানের মালিকানায় প্রকাশিত মর্নিং নিউজের সম্পাদক। পত্রিকাটি অহর্নিশ বঙ্গবন্ধুর কুৎসা গেয়েছে, বিরুদ্ধে লিখেছে এবং আগরতলা মামলার সময় তাঁর ফাঁসির দাবিও করেছে। এটি সেই পত্রিকা, বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের সময় ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় বিক্ষুব্ধ জনগণ পুড়িয়ে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারি ও সব সময় বিরুদ্ধাচারণকারী পত্রিকাটির সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক। তার নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে এবিএম মূসাকে বললেন, কোথায় আছেন বদরুদ্দিন ভাই? তিনি ভাল আছেন তো? যেভাবে পারিস তাকে খুঁজে নিয়ে আয়?

স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী মর্নিং নিউজের সম্পাদক বিহারী বদরুদ্দিন সাহেব আত্মগোপনে ছিলেন। এবিএম মূসা অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত লালমাটিয়ার একটি বাসায় তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি তখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না। অনেক আকুতি মিনতির পর দেখা হলো। এবিএম মূসা বললেন, মুজিব ভাই আপনাকে খুঁজছেন, দেখা করতে বলেছেন। চলুন আমার সঙ্গে। কথা শুনে বদরুদ্দিন সাহেবের চোখমুখ ঝলসে উঠলো। উর্দুভাষী বিহারী বদরুদ্দিন সাহেব বলে উঠলেন, 'ক্যায়া শেখ সাব মুঝে বোলায়া? আই ক্যান গো টু হিম, সি হিম?' মর্নিং নিউজের এক সময়কার বার্তা সম্পাদক, পরবর্তিতে অবজারভারের বার্তা

সম্পাদক, স্বনামধন্য সাংবাদিক এবিএম মূসার অনুরোধ তিনি ফেলতে পারলেন না। গণভবনে গেলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যেন দুই বৈরি নয়, দুই বন্ধুর মিলন হলো। বদরুদ্দিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বঙ্গবন্ধু, পাশে বসালেন। বঙ্গবন্ধু তাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? আপনি এখন কী করতে চান? কাঁহা যাতে চাহে? কোনো বিপদ নেই তো?' বঙ্গবন্ধুর মুখের আবেগময় প্রশ্ন শুনে বদরুদ্দিন আধো কান্না আধো খুশি মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'পাকিস্তান যেতে চাই। মে আই লিভ ফর করাচী?' তার কথা শুনে বঙ্গবন্ধু তার একান্ত সচিব রফিকুল্লাহকে ডেকে বললেন, 'বদরুদ্দিন ভাই যা চান, তা-ই করে দাও।' এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ভারতের সঙ্গেও নৌ-স্থল ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়নি। এসময় কিছু অবাঙালি গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও কাঠমুন্ডু হয়ে পাকিস্তান যাচ্ছিল।

এই সঙ্গে বদরুদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধুর কাছে আরেকটি আরজি করলেন। তার আসাদ অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটি বিক্রি করে সেই টাকা সঙ্গে নিয়ে তিনি পাকিস্তান যেতে চান। বাহাত্তরের সে সময় একজন বিহারির এ ধরনের একটি আবদার কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। তার পরও বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তথাস্তু, তা-ই হবে।'

বঙ্গবন্ধু এবিএম মূসাকে দায়িত্ব দিলেন, 'যেভাবেই পারিস কাজটি করে দে।' বাড়ি বিক্রির জন্য প্রধানমন্ত্রী আউট অব দ্যা ওয়ে অনুমতি দিলেন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আতাউদ্দিন খানের কাছে বাড়ি বিক্রি করা হলো। বাড়ি বিক্রির ওই টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করে দেশের বাইরে নেওয়ার অনুমতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর মর্নিং নিউজের সম্পাদক বিহারী বদরুদ্দিন বাড়ি বিক্রির টাকাসহ সচ্ছন্দে নেপাল হয়ে পাকিস্তান চলে গেলেন। (মুজিব ভাই– এবিএম মূসা)

যে সময় রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সমস্ত এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা খুঁজে খুঁজে পাকিস্তানপন্থী রাজাকার, আলবদর ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্যে বিরোধিতাকারিদের ধরে এনে প্রকাশ্যে হত্যা করছে, গণপিটুনি দিয়ে মারছে, সেসময় আপাদমস্তক পাকিস্তানপন্থী একজন সাংবাদিক (সম্পাদক) কে এভাবে খুঁজে বের করে নিরাপদে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এ ঘটনাটি প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কত বড় মাপের ও কত মহৎ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম এবং অটুট বন্ধনে আবদ্ধ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদারতা ও মহানুভবতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি সর্ব অর্থে উদার-মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ পুরুষদের একজন। তাঁর উদারতা হিমালয় পর্বতকেও হার মানায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পরশ পাথরের মতো।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় খন্দকার মোশতাককে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। তখন শুধু ক্ষমতার লোভে দলের সঙ্গে বেঈমানি করে খন্দকার মোশতাক আওয়ামী মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে শেরে বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঠিক তার ১০ বছর পর বঙ্গবন্ধু তাকে ক্ষমা করে দিয়ে আওয়ামী লীগে পদ দেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতেও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশনের ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সবকিছু শুনেও খন্দকার মোশতাক এবং তার সহচরদের ক্ষমা করে দেন। শুধু ক্ষমা করেই শেষ নয়, তিনি আবার তকে নিজের দলেও টেনে নেন। মন্ত্রীও করেন তাকে। এদিকে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন করার জন্য চীন আমেরিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন না হলে এই দুই দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রথমে নিতান্ত গুরুতর অপরাধীদের ছাড়া (হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনকারী ও অগ্নিকান্ড ঘটানোর সঙ্গে সরাসরি জড়িত) পাকিস্তানের ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিকে এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রবল বিরোধিতা করেছিল আমেরিকা। সেকথা মনে না রেখে দেশের জনগণের কথা ভেবে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু খাদ্যশস্য কিনতে গিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দেওয়া সেই ষড়যন্ত্রী ও কিলার তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে বঙ্গবন্ধু আমন্ত্রণ জানিয়ে দেশে এনে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই কিসিঞ্জারই বঙ্গবন্ধু হত্যার আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন বলে তদন্ত গবেষণায় উঠে আসছে। চুয়াত্তরে বাংলাদেশের প্রায় এক লক্ষ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যাওয়ার পেছনেও ছিল কিসিঞ্জারের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। খাদ্য সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তারা সেই খাদ্যশস্য না পাঠানোর জন্যই দেশে সৃষ্টি হয় মারাত্মক খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ। মানবতার ধ্বজাধারী পশ্চিমাদের চক্রান্তেই সেদিন খাদ্যভর্তি জাহাজ ভূমধ্যসাগরে আটকে রাখা হয়েছিল। ফলে বাংলাদেশে অনাহারে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে ও অভাবের কারণে দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষেপে যায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের ওপর। বঙ্গবন্ধুর সরল বিশ্বাস ও উদারতার নিষ্ঠুর পরিণাম ছিল এটি।

শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতাকারী তৎকালীন মুসলিম লীগের দুই নেতা, স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের মন্ত্রী সভার সদস্য আবদুস সবুর খান ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গেও ছিল বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। রাজনৈতিক সফরে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রাম গেলে ফজলুল কাদের চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাদের বাসায় খাওয়া-দাওয়া করতেন। আবদুস সবুর খানকে বঙ্গবন্ধু সব সময় 'সবুর ভাই' বলেই সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করার অপরাধে দালাল আইনে গ্রেফতার হন সবুর খান ও ফজলুল কাদের চৌধুরী। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী এবং রাজাকার ও শান্তি কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই দুই নেতার সাথে জেলখানায় যাতে কেউ খারাপ আচরণ না করেন, তার জন্য বঙ্গবন্ধুর কঠোর নির্দেশনা ছিল। সেই ১৯৪২ সাল থেকে এই দুই নেতা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আদর্শের দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর মতাদর্শে থাকলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছিলেন বিপরীতমুখী। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা ও ছিষট্টির ৬ দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এই দুই নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কাজে সরাসরি বিরোধিতা করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার আকাশসম উদারতা দিয়ে কখনও প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তাও করেননি। উপরন্তু উদারতার মহান দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন।

একাত্তরে ইয়াহিয়ার সাথে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যার অনুমোদন করে ভুট্টো। সেই বুক ভরা বেদনার কথা ভুলে গিয়ে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের স্বার্থে বঙ্গবন্ধু লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। তাতে ভারত মনোক্ষুণ্ন হয়। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের কেউ পাকিস্তান সফরের পূর্বে ভারতের সাথে কথা বলার শর্ত ছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করে যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলে তাজউদ্দীন আহমদকে ধমক দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন– 'আমি কাহারো বশংবদ নই,

আমার দেশের সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হবে।' তখনো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও এরই মধ্যে ইন্দিরা-ভুট্টোর 'শিমলা চুক্তি' (২৮ আগস্ট ১৯৭৩) হয়েছে। অবশেষে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) দিতে বাধ্য হয়। ভারতের সাথে কথা না বলেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান গেলেন। একই সাথে বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। ফেরার সময় বাংলাদেশে আসার জন্য ভুট্টোকে আমন্ত্রণ জানান বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো দেড় শতাধিক পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক উর্ধতন কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসেন। বঙ্গবন্ধু উদার চিত্তে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আপ্যায়ন করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেন।

১৯৭৪ সালের ২৯ জানুয়ারি যুগোস্লাভিয়ায় প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো বাংলাদেশ সফরে এসে নিরাপত্তা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বলেছিলেন– 'তুমি এখন তোমার নিজের সম্পত্তি নও, সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ।' কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা কানে তুলেননি। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা ১৯৭৪ সালে ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফর করেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানান। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীও ব্যক্তিগতভাবে বহু আগে তাঁকে নিরাপত্তা জোরদার করতে তাগাদা দিয়েছেন, তাও আমলে নেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত এ কথাও বলা হয়েছিল যে, অন্তত কিছু দিনের জন্য আপনি ধানমন্ডির বাসায় নয়, বঙ্গভবনে থাকুন। সে উপদেশও কানে তোলেননি তিনি। কারণ বাঙালির প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালবাসা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস। যা এক সময় তাঁর জন্য কাল হয়ে দেখা দেয়।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়ায় সালভেদর আলেন্দের (চিলির সাবেক প্রেসিডেন্ট) করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে একান্তে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সিআইএ সম্পর্কে সাবধান। সুযোগ পেলেই তারা আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'পরিণতি যাই হোক, আমি আপস করবো না।' (ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, আজকের কাগজ, ঢাকা; ৩০ মার্চ ১৯৯২)।

শুধু তাই নয়, নিজের বড় মেয়ের কথাও আমলে নেননি বঙ্গবন্ধু। শেখ হাসিনা (৩০ জুলাই '৭৫) জার্মানি যাবার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কে শুনে কার কথা! কোনো কিছুই বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি। নাড়া দেবেই বা কেন? যে বাঙালি জাতির জন্য তিনি সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন জেলে-রাজপথে- মিছিলে- সংগ্রামে, জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, সে বাঙালি আবার তাঁর ক্ষতি করবে, তা কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায়নি জাতির পিতাকে। এমন আত্মবিশ্বাসই বঙ্গবন্ধুর জন্য, জাতির জন্য কাল হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানকে সপরিবারে জীবন দিতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর আকাশের মত বিশাল হৃদয় দিয়ে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, যে বাঙালির মুক্তির জন্য তিনি তাঁর জীবন-যৌবনের উজ্জ্বল সময় পাকিস্তানীদের হাতে বার বার বন্দি হয়ে জেলের নির্জন প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন, জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছেন, পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলে তাঁর কক্ষের পাশে কবর খুঁড়েও যারা তাকে হত্যা করতে পারেনি, যিনি সমস্ত চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে থেকে বাংলার মানুষকে মন উজাড় করে ভাল বেসেছেন, সেই বাঙালি কি কোনোদিন তার সঙ্গে বেঈমানী-বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? বঙ্গবন্ধুর এই সহজ সরল উদারীকরণের খেসারত দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে।

মুক্তিযুদ্ধকে কাছ থেকে দেখা বিবিসির সাংবাদিক স্যার মার্ক টালির ধারনায়, 'বঙ্গবন্ধুর উদারতা ও ক্ষমাশীল মন বিপদ ডেকে এনেছিল। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু জাতির জনক হলেও স্বাধীন দেশে প্রশাসনিক দক্ষতার শীর্ষে উঠতে পারেননি। ভারতের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী চুক্তিটা না হলেই ভালো হতো বলে তাঁর ধারণা। তবু তিনি মনে করেন, 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শুধু ত্রাতাই নন, তিনি এই উপমহাদেশের এক বিরল নেতা।'

তৎকালের বিশ্ববরেণ্য নেতারা, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পোদগর্নি, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনি, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল জোসেফ ব্রজ টিটো, ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান শ্রী ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট স্মিথ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান হুয়ারে বুমেদিন, তানজানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জুলিয়াস নায়ারে, গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল ক্যাস্ট্রো, মালয়েশিয়ার টুংকু আবদুর রাজ্জাক, জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কেনেথ কাউন্ডা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুকে অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন তাঁর ওই মানবিক ও উদার মানসিকতার জন্য। তারাও সময় সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী দেশি-বিদেশী শত্রু, আমেরিকা ও পাকিস্তান সম্পর্কে সতর্ক থাকার কথাও বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে। কিন্তু কেউ-ই তার আস্থা ও বিশ্বাসে

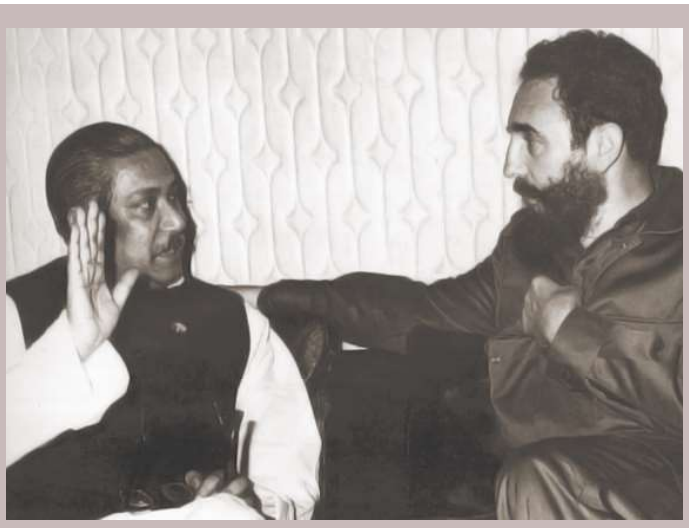

কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল জোসেফ ব্রজ টিটোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

চিড় ধরাতে পারেননি। (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ- ড. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া)

অতুলনীয় সংগঠক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। দলীয় নেতাকর্মীদের প্রত্যেককে দেখতেন নিজ পরিবারের সদস্যের মতো। প্রত্যেক নেতাকর্মীর বিপদাপদে তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতেন পরম হিতৈষীর মতো। মমতা মাখানো সাংগঠনিক প্রয়াস নিয়ে কর্মীদের হৃদয় জয় করে নেওয়ার ব্যতিক্রমী এক ক্ষমতা ছিল তাঁর। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তাঁর একটা তহবিল থাকত তোফায়েল আহমেদের কাছে। এই তহবিল থেকে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জনকে সাহায্য-সহায়তা করতেন। এর মধ্যে দলীয় নেতাকর্মী ছাড়াও প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের লোকজনও ছিল। কিন্তু শর্ত ছিল, যাদের অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে তাদের নাম-ঠিকানা গোপন রাখতে হবে, প্রকাশ করা যাবে না।

১৯৭২ সালের ১৪ এপ্রিল, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ তখন গ্যাস্ট্রিক-আলসারে আক্রান্ত হয়ে হলি ফ্যামিলিতে চিকিৎসাধীন। বঙ্গবন্ধু তাকে দেখতে যান। সস্নেহে তোফায়েল আহমেদের হাত ধরে, পরম মমতায় কপালে হাত বুলিয়ে আদর করে খোঁজখবর নেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পরশ পাথরের মতো। তাঁর পুণ্য হাতের ছোঁয়ায় এদেশের দামাল ছেলেরা নিরস্ত্র থেকে সশস্ত্র হয়েছিল, অচেতন থেকে সচেতন হয়েছিল। বজ্রকণ্ঠের অধিকারী বঙ্গবন্ধু ছিলেন অতুলনীয় বাগ্মী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলে শেষ করা যাবে না। (মুজিব আমার প্রেরণা– তোফায়েল আহমেদ)

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ১৯৭৪ সালে আকস্মিকভাবে বড় ধরনের বন্যা শুরু হলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দেশজুড়ে ঘরে ঘরে শুরু হয় অভাব। আকালের মরণ ছোবলে শত শত মানুষ তখন ভুখা-নাঙ্গা। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা জুড়ে বেরোয় মৃত মানুষের সচিত্র দলিল। তখন রংপুরের জেলা প্রশাসক রুহুল আমিন মজুমদার দুর্ভিক্ষের খোঁজ-খবর নিতে আসেন। সঙ্গে আসেন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক আফতাব উদ্দিন। স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আসা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক আফতাব উদ্দিনকে কৌশলে ডেকে নিয়ে কু-পরামর্শ দেয়। সে সময় জেলা প্রশাসক রুহুল আমীন মজুমদারকে তৎকালীন রমনা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আনসার আলী দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে জানান। কিন্তু জেলা প্রশাসক তখনও বুঝে উঠতে পারেননি এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে। পরে এ ফটো সাংবাদিক ইউপি চেয়ারম্যান আনসার আলীকে ইউনিয়ন পরিষদ সভাকক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে দুজনে নাটক সাজানোর জন্য চলে যান জেলে পল্লীতে। সেখানে পরিকল্পিতভাবে তারা বাসন্তি নামে এক অপ্রকৃতিস্থ কিশোরির সমস্ত শরীরে মাছ ধরার জাল পড়িয়ে ছবি তোলেন। ছবিতে দেখা যায়- লজ্জা নিবারণের মিথ্যে সান্ত্বনা বুকে নিয়ে একটি মেয়ে কলা গাছের ভেলায় চড়ে কলাগাছের পাতা সংগ্রহ করছে। বন্যার পানিতে আরেকজন নারী শ্রীমতি দুর্গতি রাণী বাঁশ হাতে ভেলার অন্য প্রান্তে বসে নিয়ন্ত্রণ করছেন ভেলাটিকে। (হু কিল্ড শেখ মুজিব শীর্ষক নিবন্ধ– সুভাষ সিংহ রায়)

এই ছবি ও একটি প্রতিবেদন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশে-বিদেশে তোলপাড় শুরু হয়। ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্ব মানবতা নাড়া দিয়ে ওঠে। ওই ছবিটিকে সম্বল করে জনতার সামনে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে এতটুকুও

ত্রুটি রাখেনি স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও জাসদসহ বামপন্থীরা। কিন্তু ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের পর বাসন্তির আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এত বড় জালিয়াতির পরও বঙ্গবন্ধু সেই ডিসি, ইউপি চেয়ারম্যান বা ফটো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেননি। এমন আকাশের মত উদারতা ও সাগরের মত বিশাল হৃদয়ের মানুষটি কি সত্যি বাঙালিকে ভালবেসে কোনো অন্যায় করেছিল?

বঙ্গবন্ধু কত বড় মাপের মানুষ ও কত বড় আন্তর্জাতিক নেতা ছিলেন, তার একটি উদাহরণ টেনেই নিবন্ধটি শেষ করছি। ১৯৭৩ সালের ৫-৯ সেপ্টেম্বর আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত হয় জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে ৭৩ টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও অংশ নেন। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভভাবে সুললিত কণ্ঠের ভাষণে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব' প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে উপস্থিত নেতাদের তাক লাগিয়ে দেন। সেখানে তিনি বলেন, 'বিশ্ব আজ শোষক আর শোষিত, এই দুই ভাগে বিভক্ত। আমি শোষিতের দলে। শোষকের বিশ্ব অন্তহীন ঐশ্বর্যের নগ্ন অহমিকার পদতলে পিষ্ট। এর অবসান ঘটাতে হবে।' বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে এভাবে বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া ছিল অনেকটা অকল্পনীয় এবং অসীম সাহসের কাজ। বিশ্বের সব বড় বড় দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের সামনে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের পর কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো ছুটে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সবার সামনে বলেন, I have not seen the Himalayas. But I have seen Sheikh Mujib. In Personality and in courage, this man is the Himalayas. I have thus had the experience of witnessing the Himalayas. (আমি হিমালয় দেখিনি। বঙ্গবন্ধুকে আমি দেখেছি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়সম। আমার হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা হলো।) সম্মেলনে উপস্থিত মিশরের আনোয়ার সাদাত, সৌদি আরবের বাদশা ফয়সল, লিবিয়ার কর্ণেল গাদ্দাফি, কম্বোডিয়ার প্রিন্স নারোদম সিহানুক ও তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারেসহ অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানরাও বঙ্গবন্ধুর বাগ্মিতা ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং ধন্যবাদ জানান। (ন্যাম সম্মেলন ও বঙ্গবন্ধু, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আজকের কাগজ, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯। সম্মেলনে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন)।

কী দেশে কী বিদেশে, জনসভা অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন– সব জায়গাতেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল এবং আলোচনার মধ্যমনি। আকাশের মতো উদার ছিল তাঁর হৃদয়, জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। ইতিহাসের মহামানব, দুনিয়ার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্য যেই লাভ করেছেন, তিনিই সম্মোহিত ও অভিভূত হয়েছেন। পৃথিবীতে কত নেতা এসেছেন, আসবেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর মতো এমন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষ দুর্লভ। সে জন্যই বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু, আর বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।■

● লেখক : সম্পাদক, দৈনিক স্বদেশ প্রতিদিন। সাবেক ডেপুটি এডিটর, দৈনিক যুগান্তর এবং সাবেক সম্পাদক, দৈনিক সময়ের আলো।

বঙ্গবন্ধু
বাংলার দুখী মানুষের আলোকবর্তিকা

এম. মোশাররফ হোসেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'স্বদেশী সমাজ'-এ লিখেছেন, "স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে যোগ রক্ষিত হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এই অভিলাষই যেন মূর্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মধ্যে।

বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ প্রকোপ থেকে, শতাব্দী-লালিত মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ইতিহাসের পাদপীঠে– যেখানে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষায়, বেদনা-ভালবাসায় আর কর্মের প্রবাহে আবহমান বাংলা ও বাঙালিকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু মৃত্যুঞ্জয় হয়ে আছেন বাংলাদেশের মানুষের ভালবাসায়।

বঙ্গবন্ধুকে বলা যায় 'রাজনৈতিক উদ্যোক্তা'। বঙ্গবন্ধুকে সৃষ্টিশীলতার জন্য রাজনৈতিক উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করা যায় এ কারণে যে, তিনি নতুন ধারণা, চিন্তা-চেতনা, উদ্ভাবন ও প্রয়োগিক কলা-কৌশল বাস্তবায়ন করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মদানের পাশাপাশি এবং শাসক হিসেবে উৎকর্ষ ও মানবীয় গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়েছেন। নীতিজ্ঞান বহির্ভূত কর্মকাণ্ড রোধ করে, মানব প্রত্যয়ে মুজিব রাজনীতির বিজ্ঞান-শিল্প ও কলাকৌশলকে একই সূত্রে গেঁথে সকল বাধা বিদূরিত করে জাতিকে উন্নত করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল কর্মযজ্ঞ নতুন প্রজন্মের মাঝে আলো ছড়াবে এই প্রত্যাশায় তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কেন্দ্র করে মুজিববর্ষ পালন করা বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়বদ্ধতা।

বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় 'ক্যারিসমেটিক লিডার' (Charismatic Leader) অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে ক্যারিসমা-গুণ যুক্ত হয়েছে। ক্যারিসমা হলো 'সম্মোহনী' শক্তি। যে নেতার শক্তিশালী আকর্ষণীয় ও

অনন্য ব্যক্তিগত গুণাবলী অন্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, তিনিই ক্যারিসমেটিক লিডার। বঙ্গবন্ধু এই রাজনৈতিক জীবনে এসব গুণাবলী অর্জন করেই হয়ে উঠেছিলেন দুঃখ-দৈন্যপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত-বঞ্চিত বাঙালির মহান জাতীয়তাবাদী নেতা ও বাঙালির শত-সহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র কামনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মহান রূপকার।

শেখ মুজিবের রাজনীতি প্রাসাদ চক্রান্তের সূতিকাগারে জন্ম নেয়নি, ক্ষমতার প্রলোভনে সৃষ্টি হয়নি। এ রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়েছে বঞ্চিত বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে, নীরব নিভৃত পল্লীতে, প্রতারিত শোষিত বাঙালির পর্ণকুটিরে। সে ক্ষমতার উৎস জনগণের সমবেত ইচ্ছায়, সহযোগিতায় ও সমর্থনে নিহিত, সে সুপ্ত ক্ষমতায় পুনর্জাগরণই মুজিব রাজনীতির মূলমন্ত্র। এ নেতৃত্ব বাংলার মাটি থেকে উদ্ভূত। আলো-বাতাসের আশীর্বাদপুষ্ট শস্যের মত বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে এ নেতৃত্বের উদ্যম। জনগণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অমৃতরসে সৃষ্ট। এ নেতৃত্বের বুনিয়াদ জনতার অন্তরে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির বড় বৈশিষ্ট্য হলো তিনি বাংলার মানুষের নাড়ির স্পন্দন, হৃদয়ের অনুরণন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারতেন এবং তারই আঙ্গিকে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন বলেই তিনি বাঙালির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ও স্বাধীনতার মুকুটহীন সম্রাট হতে পেরেছিলেন। তিনি মানুষকে উজ্জীবিত, উদ্বেলিত ও উদ্ভাসিত করতে পারতেন। তিনি ছিলেন রাজনীতির কবি। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হতো বাংলার মানুষের হৃদয়ের শব্দ।

স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষে ৭ই মার্চের কী অলৌকিক মুহূর্তে ভাষণটি অমন অসামান্য প্রমিত বাক্যের মিশেলে পরিশ্রুত বাচনভঙ্গি এবং আঙ্গিকগত স্বতন্ত্র কমনীয়তায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে ভাষণের সাবলীল ভাষাভঙ্গি ও মানবিক কাঠামো ছিল অতিমাত্রায় হৃদয়স্পর্শী। যে ভাষণ মানুষকে তাঁর মর্মমূল থেকে গভীরভাবে আবেগকম্পিত, উদ্দীপিত এবং জাগ্রত করে তুলেছিল। অগ্নিকুণ্ডে জ্বলন্ত বিদ্রোহী মানুষকে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে শতভাগ প্রস্তুত করে তুলেছিল। যে ভাষণে রাজনীতির কবি দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বাঙালির হৃদয়ে হাজারো বছরের লালিত বাসনা এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা– এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি বাঙালির। তাই তিনি 'পয়েট অব পলিটিক্স।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির বৈষম্য নীতি, শোষণ ও অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের

সংগ্রামী ভূমিকা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। তখন থেকেই তিনি দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালির জন্য ভেবেছেন– কোনো শ্রেণি, সংগঠন, পেশা বা গোষ্ঠীর কথা আলাদা করে ভাবেননি। সামাজিক-আর্থিক অবস্থানের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সমস্যাগুলোকে তার কর্মে ও ভাবনায় তিনি স্থান দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বাংলাদেশের ঐশ্বর্য, সম্পদ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করে প্রায়ই বলতেন, 'এ বাংলায় কি না আছে!'

বঙ্গবন্ধুর ভাবনা জুড়ে ছিল সোনার বাংলার স্বপ্ন। বাংলার দুখী মানুষের কথা তাঁর রাজনৈতিক কর্মে ও ভাবনায় কৈশোর থেকেই স্থান করে নিয়েছিল। আর এ কারণেই তাঁকে প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি জনগণের ভালবাসার উপহার হিসেবে স্বার্থক হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ইতিহাস সর্বতোভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি ফসল 'এনজিও খাত' তথা দেশের বৃহত্তম সামাজিক খাত। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন দেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই খাতের যাত্রা শুরু। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অনেক পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধু অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁর নিজের এবং দলের ধ্যান-ধারণা ও বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলেছিলেন নানা বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রস্তাবে। প্রচার পুস্তিকাতেও স্থান পায় অর্থনীতি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ, অনুন্নত অবকাঠামো সংস্কার, স্থবির কৃষি পদ্ধতি গতিশীলকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী উন্নয়ন ইত্যাদি। পরিকল্পনায় সতর্কতার সাথে কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু পরবর্তী প্রতিটি সরকার বঙ্গবন্ধুর মূল অনুসৃত নীতি 'কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী উন্নয়নের পদক্ষেপ' ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। যা এনজিও সেক্টরের কাজের একমাত্র ক্ষেত্র।

আমার অভিমত– অনেক সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত মানুষের সাথে থাকার চেষ্টা করতেন। এটাই ছিল তার কালজয়ী সক্ষমতা ও শক্তির প্রধান উৎস। মানুষের সঙ্গে থাকার নিরলস এই প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক নেতা বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ফলে তিনি 'জননায়ক' হয়ে উঠেছিলেন। সে কারণেই তিনি ইতিহাসের মহানায়ক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাইতো তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন করলে বলতেন, 'লোকজনকে খেতে দিতে পারি না, পরতে দিতে পারি না, দেখাও যদি না দিতে পারি, তাহলে আমার থাকল কী'।

চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্বেও অতুলনীয়তায় বঙ্গবন্ধু সকলের ঊর্ধ্বে ছিলেন– কী উচ্চতায়, কী চিত্তের বৈভবের বিপুলতায়। একাধারে তিনি সাহসী ও বিনম্র ছিলেন এবং ছিলেন বলিষ্ঠ চিত্তের একজন। মানুষের উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে যে রাজনীতির চর্চা বিশ্বব্যাপী চলছে, তার মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দাবি তিনি জলদগম্ভীর স্বরে তুলে ধরতেন। এজন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থাপত্রের সাথে তাঁকে বিনাশের আয়োজন করা হয়েছে একাধিকবার।

আজ বাংলাদেশে যত প্রতিষ্ঠান কার্যকর দেখছি এবং অনেক অফিস ও পুনর্বাসন প্রকল্প বঙ্গবন্ধুর সরকারই গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে শূন্য থেকে দেশ গড়া, আন্তর্জাতিক চক্র, মানুষের প্রত্যাশা সব মিলিয়ে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল।

সে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে আজ বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে কৃষি এবং কৃষির উন্নয়নে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। যেমন– কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, মৎস উন্নয়ন করপোরেশন ইত্যাদি। এগুলো বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান।

চরিত্রের দৃঢ়তা, ব্যক্তিত্বেও অতুলনীয়তায় বঙ্গবন্ধু সকলের ঊর্ধ্বে ছিলেন– কী উচ্চতায়, কী চিত্তের বৈভবের বিপুলতায়। একাধারে তিনি সাহসী ও বিনম্র ছিলেন এবং ছিলেন বলিষ্ঠ চিত্তের একজন। মানুষের উত্তেজনার মাত্রা বাড়িয়ে যে রাজনীতির চর্চা বিশ্বব্যাপী চলছে, তার মধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের দাবি তিনি জলদগম্ভীর স্বরে তুলে ধরতেন। এজন্য রাজদণ্ডের ব্যবস্থাপত্রের সাথে তাঁকে বিনাশের আয়োজন করা হয়েছে একাধিকবার। বার বার জেলে গিয়ে নিগ্রহ করার পাশাপাশি তাঁকে হত্যার জন্য বিক্ষিপ্তভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। আগরতলা মামলায় দেশদ্রোহী বলে তাঁর প্রাণনাশ করার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬ দফা আন্দোলন কর্মসূচিকে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, বাঙালি সেই শক্তি আয়ত্ত্ব করে প্রত্যাঘাত হেনে তাঁর মৃত্যুর চক্রান্ত প্রতিহত করে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরাচরিত রাজনীতির ধারা থেকে সরে এসে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজ পরিবর্তনের পথে পা বাড়ালেন। ঐকমত্যকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর এই নতুন যাত্রাপথের শুরুতেই সাম্রাজ্যবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির গভীর ষড়যন্ত্রে বাংলার আকাশে নেমে এলো গভীর বিনাশী কালরাত্রি ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫।

১৭ মার্চ বাংলাদেশের এক সোনাঝরা দিন। আলো ঝলমলে আনন্দের অনন্য এক দিন। ক্যালেন্ডারের ধারা পরিক্রমায় দিনটি এসেছে ঠিকই কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বিশেষ এই দিনটি নতুন দিনের বারতা ছাড়িয়ে গেছে। চিরবঞ্চিত, চিরশোষিত বাঙালিদের ভাগ্য বদল ও অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে চির সংগ্রামী এক মহাত্মার জন্ম এই দিনে। 'মুজিব শতবর্ষ' আমাদের প্রজন্মের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে এসেছে। দেশ-মাতৃকার জাতীয় কর্তব্য সমাপনে আমাদের সকলের সুমহান দায়িত্ব পালনের প্রদৃপ্ত অঙ্গীকার। 'আমার সোনার বাংলা' গড়ার প্রতীতিই এই দিবসের মর্মবাণী। যা বাংলার মানুষের হৃদয়ে বেড়ে ওঠা কণ্ঠস্বর। জন্মশতবার্ষিকী হোক দুরুদুরু বুকে ফুসফুস ভরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সাহসের নিঃশ্বাস। আগমনী প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া 'আমার সোনার বাংলা'। আমাদের সকলের অফুরান ভালবাসা।

এখনও বঙ্গবন্ধু বাংলার দুর্জয় তারুণ্যের হিমালয়, দুর্যোগের অমনিশায় উজ্জ্বল বাতিঘর, দুখী মানুষের আলোকবর্তিকা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন এবং 'দুখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো'র স্বপ্ন। অসংখ্যবার তিনি এই কথা উচ্চারণ করেছেন। যতদিন এ বাংলায় চন্দ্র-সূর্য উদিত হবে, পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পানি প্রবাহিত হবে, বাংলার মাঠে-ঘাটে কৃষকের পদচারণা থাকবে, কল-কারখানার শ্রমিকদের প্রদৃপ্ত ধ্বনী উচ্চারিত হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝাকরা চুলের বাবরি দোলানো ছাত্র-ছাত্রীর কলরবে মুখরিত থাকবে ততদিন ভোরের শুকতারার মতোই বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন কোটি বাঙালির হৃদয়ে।■

● অর্থ পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

বন্ধু তিনি পিতাও তিনি

আইয়ুব হোসেন

যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দুচোখ, দেখব নিয়ত-রৌদ্র ছায়ার খেলা,
যতদিন পাবো বাতাসের চুমো দেখবো তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করব শোক।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্ কবরে শায়িত আজ।

—শামসুর রাহমান

বাঙালি জাতির মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাকে বলা হয় জাতির পিতা। এই জাতির জন্য তিনি একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে বাঙালি জাতির জন্য স্বতন্ত্র একটি দেশের পত্তন করেছেন, বাংলাদেশ যার নাম। এজন্যই জাতির পিতার মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। তার আগে এ দেশবাসী, বিশেষ করে ছাত্রসমাজ শ্রদ্ধা, সম্মান ও আদর করে তাকে আরেকটি অভিধায় অভিহিত করে। পাকিস্তানি শাসকরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে ইতিহাসখ্যাত মিথ্যা মামলায় তাকে অভিযুক্ত করে। কারাগারে আটকে রাখে অনেকদিন। বাঙালি ছাত্র-জনতা সারা দেশে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্লোগান দিতে থাকে- জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো। তালা ভাঙবার উত্তাপ আঁচ করে পাকিস্তানী শাসকরা শেখ মুজিবকে মুক্ত করে দেয়। জেল থেকে বেরিয়ে এলে ছাত্ররা তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়ে বরণ করে নেয়। নাম হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মধুমতি নদী বয়ে গেছে গোপালগঞ্জ জেলার ভেতর দিয়ে। গেছে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ভেতর দিয়েও। এই গ্রামেই শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। তিন ভাইবোনের একমাত্র ভাই তিনি। বড় দুই বোনের পর বাবা মায়ের বড় আশা একটি পুত্র সন্তানের। শেখ মুজিব জন্ম নিলে তাদের সাধ পূরণ হয়। বড় আদরের সন্তান। নাম দিলেন খোকা। ডাক নাম। বাবা শেখ লুৎফর রহমান। আর মার নাম সাহারা খাতুন। ছোট বেলা থেকে শেখ মুজিব ছিলেন কোমল স্বভাবের। গরিব-দুখী মানুষের কষ্ট দেখলে তিনি সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন। খাবার বিলিয়ে দিতেন। অকাতরে বিলানো দেখে একদিন তার মা বললেন, খোকা তুমি যে সব ওদের দান করে দিচ্ছ, আমরা খাব কি? খোকা জবাব দেয়, আমরা তো খাচ্ছিই, ওরা তো খাবার খেতে পায় না। শৈশবকাল থেকে মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ লক্ষ্য করা গেছে। এরকম দু একটি ঘটনা বলা যায় এখানে। একদিন

মুজিব দেখেন শীতকালে এক বুড়ো মানুষ শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনি তার কষ্ট উপলব্ধি করে নিজের গায়ের চাদর বুড়োর গায়ে জড়িয়ে দেন। আরেক দিন তার স্কুলের এক গরিব বন্ধু বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরছে। বন্ধুটির বাড়ি কিছু দূরে বলে সারা পথই তাকে ভিজে যেতে হবে। মুজিব বন্ধুর কষ্টে ব্যথিত হলেন ও ছাতাটি তাকে দিয়ে দিলেন। এজন্য বাড়ি ফিরে তাকে বকুনি খেতে হয়েছিল। শেখ মুজিবদের পরিবার খুব স্বচ্ছল ছিল না। অভাব অনটনের ভেতর দিয়ে তাদের চলতে হতো। ছোটকাল থেকে মুজিব যেমন ছিলেন চঞ্চল তেমনি দুরন্ত। তার মতন দুরন্ত ছেলে আরও ছিল। কিন্তু মুজিব ছিলেন দুরন্তপনায় সেরা। সবাই সেজন্য ভয় করতো আবার ভালোও বাসতো। তাদের নেতা ছিলেন মুজিব। মুজিব না হলে খেলা জমে ওঠে না। আর দলও সরগরম হয় না।

চঞ্চলতার জন্য মুজিবের লেখাপড়া শুরু হয় কিছুটা দেরিতে। সাত বছর বয়সে স্কুলে যেতে শুরু করলেন। ভর্তি হলেন গিমাডাঙ্গো প্রাইমারি স্কুলে। তৃতীয় শ্রেণীতে ওঠার পর স্কুল বদল হলো। এরপর গেলেন স্থানীয় মিশনারি স্কুলে। চোখের একটি জটিল রোগের নাম বেরিবেরি রোগ। সেই রোগে আক্রান্ত হলেন মুজিব। একটি চোখে অপারেশন করতে হলো। এর ফলে চার বছরের জন্য লেখাপড়া বন্ধ থাকে। আঠারো বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে আবার মিশন স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। স্কুলে যখন অস্টম শ্রেণিতে পড়ছিলেন, তখন স্কুল পরিদর্শনে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা সভায় পুষ্পমাল্য দেয়া হলো। প্রধান শিক্ষক মানপত্র পাঠ করলেন। অনেকে বক্তৃতা করলেন। সবই হলো। কিন্তু কেউই ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী বরাবর তুলে ধরলেন না। সাহস করে কেউ দাবি-দাওয়ার কথা জানাতে পারলো না। হালকা পাতলা ও লম্বাটে গড়নের শেখ মুজিব সাহস করে এগিয়ে গেলেন। জেদ করে বললেন, আমাদের অসুবিধার কথা আমিই বলবো। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে ভিড় ঠেলে শেরে বাংলার নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, আমাদের দাবি পূরণ না করে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। শেরে বাংলা মুজিবের সাহস ও প্রত্যয় দেখে চমৎকৃত হলেন। অবিলম্বে তিনি দাবি মেটানোর আশ্বাস দিলেন। ছেলেবেলা থেকেই মুজিব ছিলেন এরকম একরোখা স্বভাবের। সাহস এবং জেদ তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে বালক বয়স থেকে।

মুসলমান ছাত্রদের একমাত্র সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন। এতে তিনি যোগ দেন ১৯৪০ সালে। এক বছরের জন্য ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪২ সালে। এরপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে। একই বছর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বি এ পাশ করেন ১৯৪৭ সালে। একই সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে আলাদা দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। ঠিক এ সময়ই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয় কলকাতায়। আগুন, সংঘর্ষ ও মানুষের মৃতদেহের স্তূপ চারদিকে। এই পরিস্থিতিতে শান্তিবাদী মানুষেরা দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর সঙ্গে জড়িত হন শেখ মুজিব। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যান্যের সঙ্গে তিনি দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য কাজ করেন। এরপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। পরের বছর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। সে বছরই ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক নতুন দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে এর অংশ হয় দুটি। একটি পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। সবাই আশা করেছিলেন এবার বুঝি আর শাসন-শোষণ থাকবে না। জুলুম-নির্যাতন থাকবে না। কিন্তু না, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চাইলো। সকল ব্যাপারে পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র আঁটতে লাগলো। তারা প্রথম আঘাত হানলো ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। পাকিস্তানের দুই অংশেরই রাষ্ট্রভাষা উর্দু বলে তারা ঘোষণা করলো। বাঙালি জাতি এই হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তারা গর্জে উঠলো। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হলো। শেখ মুজিবসহ সে সময়ের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় বাংলা ভাষার পক্ষে জোরদার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। গ্রেফতার করা হলো শেখ মুজিব এবং আরো অনেককে। ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট পালন করতে থাকেন। গরিব কর্মচারীদের আন্দোলনের সঙ্গে শেখ মুজিব জড়িত হয়ে যান ওতোপ্রোতভাবে। এজন্য তাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অযৌক্তিকভাবে জরিমানা ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ বছরের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। শেখ মুজিব তখন জেলে। সে অবস্থায়ই তিনি দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুলাই মাসে ছাড়া পাবার পর ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে আবারও তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এরপর আসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চলাকালে মুজিব ছিলেন কারাগারে। একুশের দিনে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মুজিব জেলখানায় একটানা ১৩ দিন অনশন পালন করেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭ জুন পল্টন ময়দানের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। গণপরিষদের (জাতীয় সংসদ) অধিবেশন চলাকালে শেখ মুজিব পরিষদের স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা বহুবার দাবি জানিয়ে আসছি, আপনারা এটাকে (পূর্ব পাকিস্তান) বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটির একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য।'

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলাম ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে। শাসকের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলেই বলতো- ইসলাম গেল, ইসলাম গেল। এজন্য আওয়ামী লীগকে সর্বজনীন দল হিসেবে পরিচিত করার জন্য মওলানা ভাসানীর প্রস্তাবে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবর দলের কাউন্সিল অধিবেশনে এ প্রস্তাব পাস হয়। শেখ মুজিব দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন মেজর জেনারেল আইউব খান। নিষিদ্ধ করা হয় রাজনীতি। মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকে আটক করা হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে ছাড়া পান। জননিরাপত্তা আইনে পরের বছর ২ জুন আবারো গ্রেফতার করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯৬৫ সালে পুনরায় গ্রেফতার হন। বাঙালীর মুক্তিসনদ বলে পরিচিত ঐতিহাসিক ৬ দফা তৈরি হয়। পাকিস্তানের বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬ দফা পেশ করেন। এ বছরই তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৮ মে আবার তিনি গ্রেফতার হন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হয়। এর এক নম্বর আসামী করে তাকে ঢাকা সেনানিবাসে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে সামরিক সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। পরদিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ১০ লাখ লোকের সমাবেশ হয়। সমাবেশে ছাত্র সমাজ তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। নামের সঙ্গে যুক্ত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বেসামাল

রাজনৈতিক অবস্থা দেখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচন। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ৩০৫টি আসনে শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ জয়যুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকরা ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা হস্তান্তর স্থগিত করে। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ এর প্রতিবাদে হরতাল হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করেই ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' এরপর থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। হঠাৎ করে ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। রাত ১টায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেফতার বরণের পূর্বক্ষণে তিনি এক বার্তা দিয়ে যান। তাতে বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।' এই ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য এই আমরা ওদিন স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। বার্তাটি চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বার বার প্রচারিত হয়। এরপর শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। আমরা যাকে বলি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সেটা চলে টানা নয় মাস। ৩০ লাখ নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের প্রাণের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রায় সারাটি জীবন ব্যয় করে গেছেন। অত্যাচার নির্যাতন সয়েছেন, কারাভোগ করেছেন। জেল খেটেছেন ১১টি বছর। কিন্তু কখনো শাসক ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেননি। বাঙালি জাতি অবিসংবাদিত এই নেতাকে জাতির পিতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এ দেশ, এই জাতি যতদিন পৃথিবীর মানচিত্রে অটুট থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও অমর হয়ে থাকবেন। এখন থেকে সাড়ে চার দশক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। অস্বাভাবিক প্রয়াণ কবলিত হয়ে তিনি মহাপ্রয়াণে ধাবিত হয়েছেন। ভারতের বিশিষ্ট লেকক ও বুদ্ধিজীবী অন্নদা শংকর রায় বঙ্গবন্ধুর হত্যা সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন,

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের বছর দেড়েক আগে এক বাঙালি মুসলিম ভদ্রলোক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তার কন্যাকে বিশ্বভারতীর কোনো এক বিভাগে ভর্তি করার জন্য। একদিন তিনি সুজিত বাবুর কন্যাকে বলেন, 'দেখবেন রুচিরাদি, একদিন আমরা শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করব।' ঘটনার পরে এই কথা শুনে আমি একেবারে হতভম্ব হয়েছিলাম। হত্যার পরিকল্পনাটি তাহলে বাংলাদেশের সংবিধানে সম্প্রতি সংযোজিত চতুর্থ সংশোধনী, বাকশাল গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপের জন্য নয়, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ গড়ার জন্য। সেটাই বঙ্গবন্ধুর আসল অপরাধ এবং এর জন্য একদিন তাকে চরম দণ্ড পেতে হলো। তাও সপরিবারে। একজনও নাহি রবে বংশে দিতে বাতি– কৃত্তিবাসী রামায়ণে পড়েছিলাম রাবণের সম্বন্ধে। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই কন্যা রয়ে গেলেন, হাসিনা ও রেহানা, শেখ মুজিবের বংশ। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের জনগণের ভোটে শেখ হাসিনা নির্বাচনে সফল হয়ে সরকার গঠন করেছেন–এটি একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা। সুদীর্ঘ বিরতির পর বঙ্গবন্ধুর পুনরুত্থান ঘটল। এটা এক প্রকার রেজারেকশন। কবর থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন জনগণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের সেবা করার জন্য। জনগণ তাকে ভোলেনি, ভুলবেও না। তবে তার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা আবশ্যক। যেমন হয়েছে ফজলুল হক সাহেবের বেলায়, নাজিমুদ্দিন সাহেবের বেলায় ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বেলায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কীর্তি তাদের কীর্তির থেকেও দীর্ঘস্থায়ী হবে। কারণ, বাংলাদেশেই তার কীর্তি। তার সম্বন্ধে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি যা লিখেছিলাম তা আরও একবার উদ্ধৃত করি।

যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। তার ডানপাশে বসিয়েছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, 'আমি যখন বুঝতে পারলাম আমাদের দেশ স্বাধীন হতে চলেছে তখন আমি আমার অনুগামীদের জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের নাম কি হবে? তখন কেউ বলেন, পূর্ব বাংলা, কেউ বলেন, পাক বাংলা। আমি বলি– না, বাংলাদেশ। তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ধ্বনি কি হবে? আমি নিজেই উত্তর দেই, জয় বাংলা।'
গোপালগঞ্জে কিশোর বয়সে থানায় ঢিল ছুঁড়ে তিনি তার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাকশাল নামক এক প্রকান্ড ঢিল ছুঁড়ে তিনি তার জীবনের ইতি টেনেছেন।■

● লেখক : সাংবাদিক, গবেষক
সাধারণ সম্পাদক, জনবিজ্ঞান ফাউন্ডেশন

ইসলামি সংস্কৃতি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

শাহরিয়ার ইফতেখার ফেরদৌস

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নেও ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেন। স্বাধীনতা অর্জন মুহূর্তে দেশে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২০%। বঙ্গবন্ধু শিক্ষার হার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। কারণ, আমরা যে পিছিয়ে আছি, শোষণের শিকার হয়েছি এটাও তার বড় কারণ, তিনি ভেবেছেন, মানুষ শিক্ষিত হলে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারবে, দেশের উন্নয়নে অংশ নিতে সক্ষম হবে। একইভাবে তিনি দেশে মাদ্রাসা শিক্ষারও উন্নয়ন চাইতেন। যেখানে শুধু আরবি নয়, সাথে বাংলা, ইংরেজিও পড়ানো হবে। মাদ্রাসা ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে।

১৯৭৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাচ্ছেরীনের উদ্যোগে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে শিক্ষক ও আলেম ওলামাদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় এ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ। তাদের অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন।

এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু এ দেশে মাদরাসা শিক্ষা উন্নয়নে নীতি নির্ধারণী নির্দেশনা দিয়ে মাদরাসা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেমেদ্বীন ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের নীতিমালা মেনে শুরু হয় স্বায়ত্বশাসিত মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের যাত্রা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ইসলাম ধর্মের সেবায়, ইসলাম চর্চা ও গবেষণার জন্য বায়তুল মোকাররম মসজিদ নিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং একজন প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও মেশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা ফজলুল করিমকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে দুইজন আলেমকে নিয়োগ দিয়ে তিনি আলেমদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন।

একটি উঁচুমানের মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি কতটুকু ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অনেক বক্তৃতায় এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে বেতার ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বিশ্বাসী ইসলামের বিশ্বাসে, আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে কারিম (দ.) এর ইসলাম, যে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অনেক মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারে তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করে দুনিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য।'

১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত বাতাসে এসে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেরে ফেলো। আমি বাঙ্গালী, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। মুসলমান একবার মরে, বারবার মরে না।' বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করলেও দেশ শাসনের সুযোগ তিনি বেশি দিন পাননি। মাত্র সাড়ে তিন বছরের ক্ষমতায় তিনি বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ও কল্যাণে যা করেছেন, তা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন

পাকিস্তানের ২৪ বছরেও এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্থাপন হয়নি, কিন্তু স্বাধীনতার এক বছরের মাথায় বঙ্গবন্ধু তা করে দেখালেন। বঙ্গবন্ধু সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ'কে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেন। তার সেই পদক্ষেপের ফলেই আজকে বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার দাখিল, আলিম, ফাযিল, কামিল মাদরাসা ও ১৭ হাজার ইবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীগণ দেশ ও ইসলামের সেবার সাথে সাথে সমাজ উন্নয়ন, জঙ্গিবাদসহ সকল অনৈতিক কাজ থেকে দেশের মানুষকে সচেতন করছে যা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ সকল মাদরাসা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ নাগরিক।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সেবায় একটি সুদূর প্রসারী অবদান রেখে গেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারি অর্থে পরিচালিত একটি সংস্থা। যার মাধ্যমে কুরআনের বাংলা তরজমা, তাফসির, হাদিস গ্রন্থের অনুবাদ, রাসূল (সা.) এর জীবন ও কর্মের উপর রচিত ও অনূদিত বই পুস্তক, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি আইন ও দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহাবী ও মনীষীদের জীবনী ইত্যাদি নানা বিষয়ে হাজার হাজার বই পুস্তক প্রকাশ, ৬৪ জেলা কার্যালয়, ২৮টি ইসলামিক মিশন, ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মসজিদভিত্তিক মক্তব, পাঠাগারসহ নানাবিধ কাজের মাধ্যমে সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, এতে ইসলামের আলোকিত ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ

বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা না দিয়েও ইসলামের মৌলিক কার্যক্রমের সাথে কোনো আপোস করেননি বঙ্গবন্ধু। সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিকদের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ও সুন্দর একটি ইসলামি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়ার দৌড় নিষিদ্ধ করেন। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা) এর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু এসব বন্ধ করে রেসকোর্স ময়দানে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে সে যায়গায় ফলদবৃক্ষ রোপণ করেন এবং আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে রেসকোর্স ময়দানের নামকরণ করেন।

ওআইসি সম্মেলনে যোগ না দেয়ার জন্যে দেশের ও বিদেশের অনেকের পরামর্শ ও নিষেধ সত্ত্বেও স্বাধীন দেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকার হিসেবে তিনি এতে যোগদান করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষ মুসলমান। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এর সাথে যুক্ত হবো, তাতে কারো কিছু বলার নেই।

কাকরাইল মসজিদ ও বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ

বঙ্গবন্ধুই বিশ্ব মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা, ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ করে ইসলামের পথে দাওয়াতি কার্যক্রমের সুবিধার্থে ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন। তদ্রুপ তাবলিগ জামাতের কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসেবে পরিচিত কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণ এবং মসজিদের জায়গাও তিনি বরাদ্দ দেন।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই প্রথম বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের তাফসির করা শুরু হয়, যা এখনও বিটিভিসহ অন্যান্য প্রায় সকল টিভি চ্যানেলে চালু রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ পবিত্র কুরআনের মহিমায় মহিমান্বিত হচ্ছেন।

সরকারি ছুটি

পাকিস্তান আমলেও ইসলামের পবিত্র দিবস সেভাবে পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরকারিভাবে পবিত্র দিবসগুলো উদযাপনের জন্য সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুই ব্যবস্থা করেন এবং ঈদে মিলাদুন্নবী, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদরে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন এবং এই সকল পবিত্র দিনে সিনেমা হল বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু নিজে ১৯৭৩ ও '৭৪ সালে বায়তুল মোকাররাম চত্বরে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা সন্নিবেশিত করলেও তিনি মনে প্রাণে একজন মুসলমান ছিলেন, যা তার এসব কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়।

হজ্জ পালনে সরকারি অনুদান

সদ্য স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধুই প্রথম ইসলামের পবিত্র ইবাদাত হজ্জ পালনের ব্যবস্থা করেন এবং হজ্জযাত্রীদের জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক ও ভঙ্গুর থাকা সত্ত্বেও সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

১৯৭৪ সালে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ করে। এই সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। উক্ত সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে মুসলিম বিশ্বের নেতাদের সাথে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। ওআইসি বাংলাদেশকে সদস্য হিসেবে পেয়ে আরো শক্তিশালী হয়েছে। ওআইসি সম্মেলনে যোগ না দেয়ার জন্যে দেশের ও বিদেশের অনেকের পরামর্শ ও নিষেধ সত্ত্বেও স্বাধীন দেশের স্বাধীন সার্বভৌম সরকার হিসেবে তিনি এতে যোগদান করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকে সমুজ্জ্বল করেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমরা বঙ্গবন্ধুকে হারিয়েছি। কিন্তু তাঁর উদ্যোগ ধ্বংস হয়ে যায়নি। আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সরকার প্রধান হিসেবে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ইসলাম ও দেশের সেবায় তাঁর মরহুম পিতা বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত নীতি নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছেন।

তিনি আলেম-ওলামার শত বছরের দাবি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন, কওমি সনদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদরাসা শিক্ষার অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর নির্দেশেই হয়েছে, আরও হচ্ছে। মাদরাসা শিক্ষকদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর হয়েছে, নতুন জনবল কাঠামো হয়েছে, মাদরাসা শিক্ষায় অনার্স, মাস্টার্স চালু হয়েছে, মাদরাসাগুলোতে দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টিতে প্রায় ৭৮টি মাদরাসায় অনার্স, ২৮টি মাদরাসায় মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার্থীগণ আজ মাদরাসায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ছে। মাদরাসার ৫ম ও ৮ম শ্রেণিতে সরকারি বৃত্তি ছিল না, তাও হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড। তার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষার্থীগণও নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করছে। এমনকি বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতেও নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছেন মাদরাসা শিক্ষার্থীরা।■

● লেখক : শিক্ষার্থী, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম, ইউল্যাব ইউনিভার্সিটি

৪৬৮২ দিন
এক কিংবদন্তির কারাবাস

বিদ্যুত খোশনবীশ

রাজনীতি ও কারাগার– উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। শুধু উপমহাদেশই বা কেন, পশ্চিমা বিশ্ব বাদে তামাম দুনিয়ায় কম-বেশি একই রূপ। পশ্চিমাদের সাথে হালে অমিল থাকলেও তাদের অতীত এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশীয়। ফলে কারাজীবন হয়ে উঠেছে অনেক রাজনীতিকের কিংবদন্তিতুল্য জীবনের ঐশ্বর্য; কিংবা কখনো কারাজীবনই অনেক রাজনীতিককে দিয়েছে কিংবদন্তি মূল্য।

উপমহাদেশের মহাত্মা গান্ধী, সুবাস চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা তেমনই কয়েকজন। তবে শুধু কারাগারই তো আর একজন ব্যক্তিকে কিংবতন্তি করে তুলতে পারে না, থাকতে হয় অনন্য জীবন সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর কোন এক সোনালী স্বপ্নের মিলিত বুনন। উপরের প্রত্যেকেই ছিলেন এই তিনের সমারোহে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপটে অভিন্ন গন্তব্যের অভিযাত্রী। এই গন্তব্য মুক্তির, প্রগতির, সমৃদ্ধির। এই অভিযাত্রায় ছিলেন আরো একজন; কিংবদন্তি তিনি, মহাকাব্যিক জীবন তাঁর। তিনি রাজনীতির মহাকবি শেখ মুজিবুর রহমান– হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা এবং বঙ্গবন্ধু তিনি। শুরুটা বৃটিশ আমল থেকে হলেও বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের সবটুকুই কেটেছে ইতিহাসের অন্যতম নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা পাকিস্তানী সেনা শাসনামলে। তাঁর কারাজীবনের সূচনা হয়েছিলো এক তুচ্ছ রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর শেষ হয়েছিলো পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন এক রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৭২। দিনের হিসেবে চার হাজার ছয় শ ৮২। এক মহাকাব্যিক জীবনের এক-চতুর্থাংশ প্রায়! এজন্যই জীবদ্দশায় বঙ্গবন্ধু কারাগারকে বলতেন 'দ্বিতীয় নিবাস'। সত্যিই তো, যাঁর স্ত্রীকে প্রতিনিয়তই একটি স্যুটকেস প্রস্তুত রাখতে হতো স্বামীর জেলযাত্রার জন্য, জেলখানাকে তো তাঁর দ্বিতীয় ঠিকানাই বলতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুজিব কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'শেখ কামাল আব্বাকে কখনো দেখে নাই, চেনেও না। আমি যখন বারবার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, আব্বা আব্বা বলে ডাকছি, ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে... ও হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করলো, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু

আব্বা বলে ডাকি।'

বাঙালির অধিকার আদায় ও পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ হিসেবে আয়োজিত প্রায় প্রতিটি জনসভার পরপরই গ্রেফতার করা হতো মুজিবকে। এমনকি, সামরিক জান্তা একের পর এক মামলা প্রস্তুত রেখেছে যাতে একটিতে জামিন হওয়ার পর আরেকটি দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা যায়। পুরো আইয়ুব প্রশাসনের একমাত্র কাজই যেন ছিলো শেখ মুজিবকে জেলে রাখা! গভর্নর মোনায়েম খান তো বলেই রেখেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে থাকবেন, ততোদিন মুজিব দিনের আলো দেখতে পাবেন না। অর্থাৎ শেখ মুজিবকে কারাগারের অন্ধকারে রাখাই ছিলো পাকিস্তান শাসনযন্ত্রের নৈমিত্তিক দায়িত্ব। শুধু কি আটক রাখা! না, তাও নয়। বাঙালির পাঞ্জেরীকে হত্যা করাই ছিলো তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অপেক্ষা ছিলো শুধু উপযুক্ত অভিযোগ ও মোক্ষম সময়ের। ৬৮'র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিলো সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি জোড়ালো পদক্ষেপ। কিন্তু ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে পাক-জান্তা নিঃশর্তভাবে ঐ মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তির এক দিন পরই শেখ মুজিব হয়ে উঠেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা নেয়া হয় ৭১-এর নভেম্বরে। সামরিক আদালতে ক্যামেরা ট্রায়ালে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষিত হয় পাঞ্জাবে। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কাছে ক্রমাগত নাস্তানুবাদ হতে থাকা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কারণে সে রায়ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি আইয়ুব খানের উত্তরসুরী ইয়াহিয়া খানের পক্ষে। একটি জাতির জনক হয়ে উঠা যার ভবিতব্য, কারাদন্ড কিংবা ফাঁসির আদেশ তাকে পরাভূত করবেই বা কিভাবে!

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম কারাভোগ করেন ১৮ বছর বয়সে, ১৯৩৮ সালে। সে সময় একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গোপালগঞ্জ সফরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এক বিবাদের কারণে সাত দিন কারাভোগ করতে হয় তাঁকে। পরে অবশ্য ঐ মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিলো। এর দুই বছর পর ১৯৪০ সালে গোপালগঞ্জে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাসেমের একটি জনসভায় কথিত অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তিনি গ্রেফতার হন এবং দিন কয়েক কারাভোগ করেন।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিক্ষোভ চলাকালে সচিবালয়ের গেট থেকে শেখ মুজিবসহ আনুমানিক ৭৫ জনকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান সরকার। কয়েকদিন পর মুক্তি দেয়া হয় সবাইকে। একই বছর সেপ্টেম্বরে নিরাপত্তা আইনে আবারও গ্রেফতার করা হয় তাঁকে, এ পর্বে বছরের বাকি সময়টুকু জেলে কাটে তার।

১৯ এপ্রিল ১৯৪৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে উপচার্যের বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে গ্রেফতার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। আন্দোলনে অংশ নেয়ায় তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে পাঠানো হয় এবং জরিমানা করা হয় ১৫ টাকা। কিন্তু শেখ মুজিব এই জরিমানা পরিশোধ ও মুক্তির জন্য মুচলেকাপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে মুক্তি পেতে অপেক্ষা করতে হয় জুলাইয়ের ১৭ তারিখ পর্যন্ত। এ সময় কারবন্দী থাকা অবস্থাতেই ২৩ জুন সদ্য প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি।

১৯৫০ সালের পহেলা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এর আগের বছরের ১১ অক্টোবর ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে অনশন চলাকালে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে। তিন মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হন তিনি। বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জে, তারপর ফরিদপুরে এবং সর্বশেষে খুলনা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে পার হয়ে যায় ১৮ মাস। জামিনে মুক্তি পেয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় লঞ্চঘাট থেকে আবারও গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তিনি আটক থাকেন ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মূলত, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেলখানাতেই অনশন শুরু করলে পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়।

কোলকাতা হয়ে করাচি ভ্রমণ করার অপরাধে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিন্টো রোডের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। এ সময় বেশ কয়েকদিন কারাবন্দী থাকার পর মুক্তি পান তিনি। কিন্তু একই বছর ১৬ জুন তিনি আবারো গ্রেফতার হন এবং ৮ মাস কারাভোগ শেষে ১৯৫৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি লাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন, বেআইনি ঘোষণা করা হয় সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম। ১২ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে কোন অভিযোগ ছাড়াই ১৪ মাস জেলে কাটান তিনি। কিন্তু ছাড়া পাবার পরপরই আবারও আরেক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয় তাঁকে। এ পর্বে জেল খাটতে হয় টানা ৩ বছর। তাঁর আইনজীবীর করা এক রিট পিটিশনের কারণে হাইকোর্টের নির্দেশে মুজিব মুক্তি পান ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখে।

এরপর জননিরাপত্তা আইনে আবারও গ্রেফতার ৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মুক্তি মেলে ১৮ জুন।

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেয়ায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ডিসেম্বরের ৩ তারিখে, মুক্তি পান পরের বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর।

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সরকার ১৮ এপ্রিল গ্রেফতার করে তাঁকে। কিছুদিন পর জামিনে মুক্তি পেলেও জাতীয় প্রতিরক্ষা আইনে ৮ মে আবারও গ্রেফতার করা হয়। মুক্তি মেলে ১৯৬৮'র ২৮ জানুয়ারি। কিন্তু এবারও মুক্তির পরপরই পাকসেনারা তাকে জেল গেট থেকে আটক করে নিয়ে যায়, দায়ের করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, যা 'আগরতলা মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলায় আটক আরো ৩৪ জনসহ শেখ মুজিবের বিচার কার্যক্রম শুরু হয় ১৮ জানুয়ারি এবং বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হয় ২১ এপ্রিল। কিন্তু ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলার সকল অভিযুক্তকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়।

এরপর এলো একাত্তর। ২৫ মার্চ কালরাতে শুরু হলো পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক এক পৈশাচিক আস্ফালন। জেনারেল নিয়াজি যে রাত সম্পর্কে বলেছেন, 'শান্তিপূর্ণ রাত হয়ে উঠলো আর্তনাদ, চিৎকার আর দহনের কাল।...পাকসেনাদের বর্বরতা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো বুখারা ও বাগদাদে চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের বর্বরতাকে, কিংবা জালিয়ানওয়ালা বাগে বৃটিশ নৃশংসতাকেও।' বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে প্রথমে সংসদ ভবন ও পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজে। এরপর করাচি ও পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি কারাগারে। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির কাছে আনুষ্ঠানিক পরাজয় মেনে পাকিস্তান সরকার ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয় শেখ মুজিবকে। ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন জাতির পিতা পরিচয় নিয়ে।

এটাই ৪৬৮২ দিনের খতিয়ান। এক কিংবদন্তির জীবনের সিকি ভাগের পরিসংখ্যান। তবে এমন সংখ্যা আরো একটি আছে। ১৩১৪। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতার জীবনের অবশিষ্টাংশ, যার সীমারেখা টেনে দিয়েছে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।■

● লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

সূত্র : Prision Timeline, 7th March Foundation
For Bangabandhu, Prison was a Second Home by Syed Badrul Ahsan

দুর্লভ আলোকচিত্রে
বঙ্গবন্ধু

বাবা, মা ও স্ত্রীসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

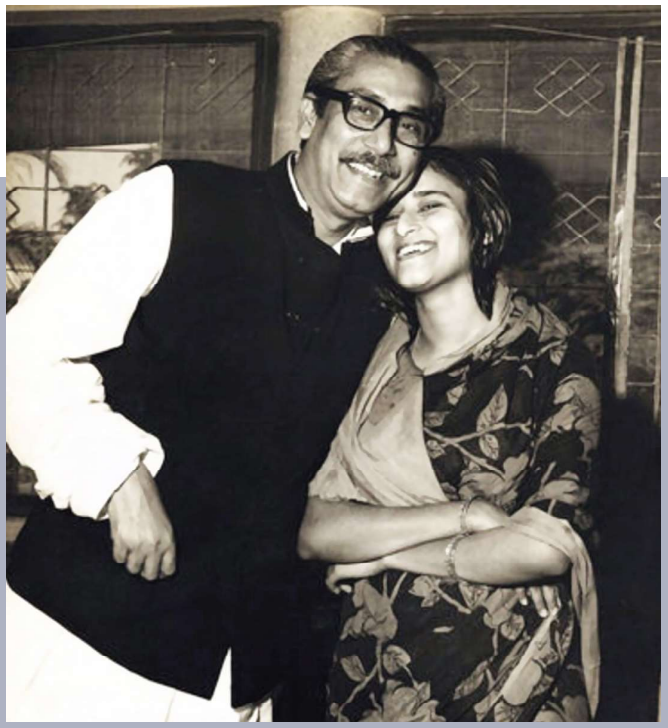

১৯৭২: কন্যা শেখ হাসিনার সাথে পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভারতীয় ফটোগ্রাফার বাল কৃষ্ণানের তোলা ছবি।

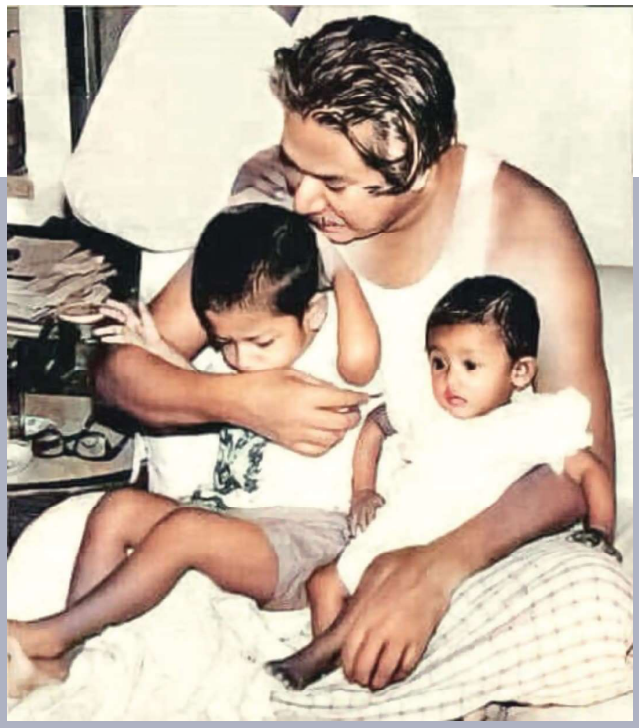

বঙ্গবন্ধুর কোলে নাতি সজীব ওয়াজেদ জয় ও নাতনি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। সম্ভবত ১৯৭৪।

১৯৫৪: নৌকায় করে রাজশাহীতে সাংগঠনিক সফর করছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান।

১২ মার্চ ১৯৭২: ভারতীয় মিত্র বাহিনীর আনুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠানে ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধুর সাথে মিত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল অরোরা।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২: বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের সরকারি বাসভবনে সাক্ষাৎ শেষে বিদায় জানানোর সময় নিজ হাতে বঙ্গবন্ধুকে গাড়ির দরজা খুলে দেন তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাডওয়ার্ড হিথ।

মুরগীর ঝোল দিয়ে একসাথে ভাত খাওয়ার জন্য নিজ বাসভবনের নিরাপত্তারক্ষীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর জীবনপঞ্জি

এক মহাকাব্যিক জীবনের
স ম য় রে খা

টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফুর রহমানের পুত্র শেখ মুজিব। বাবা-মা ডাকতেন 'খোকা' বলে। কালক্রমে এই খোকাই হয়ে উঠেছেন একটি জাতির জনক। সে জাতিরই গর্বিত সন্তান আমরা। ৫৫ বছর খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু সময় নামক বিচারকের রায়ে তিনিই হয়ে উঠেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এক মহাকাব্যিক জীবন তাঁর। সে জীবনের সবগুলো পঙক্তি হাতেগোনা কয়েকটি পাতায় ঠাঁই দেওয়া অসম্ভব কাজ। কিন্তু প্রতিটি যাত্রায় নির্মিত হয় নির্ভিক যাত্রীর বিজয় ফলক। প্রতিটি ফলক হয়ে উঠে ইতিহাসের এক একটি সোনালি অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সেই অধ্যায়গুলোর সংযোগেই অঙ্কিত হয়েছে এই সময়রেখা।

এ রেখার শেষ বিন্দুতে অন্ধকার– ১৫ আগস্ট ১৯৭৫। তবে এই অন্ধকার শেখ মুজিবের নয় পুরো বাঙালি জাতির।

১৯২০

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা শেখ সায়েরা খাতুন। ৪ কন্যা এবং ২ পুত্রসন্তানের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তৃতীয়। মা-বাবা তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতেন।

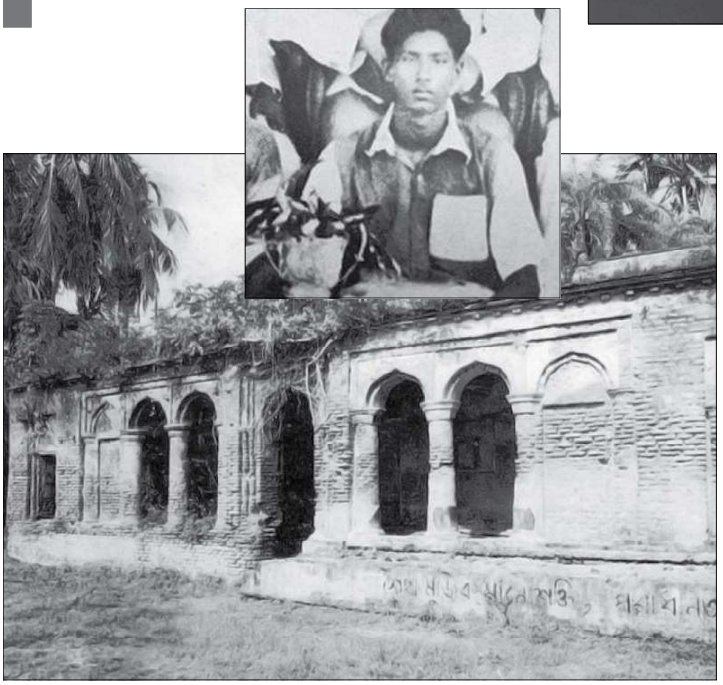

১৯২৭

সাত বছর বয়সে শেখ মুজিবুর রহমান গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে তাঁর স্কুল জীবন আরম্ভ করেন। নয় বছর বয়সে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্র আন্দোলন এবং রাজনীতিতে পুরোপুরি সক্রিয় হয়ে ওঠার আগে অন্য আরো দশজন কিশোরের মত শেখ মুজিবুর রহমান খেলার মাঠকেই বেশি ভালোবাসতেন। ফুটবল খেলার প্রতি ছিল তাঁর দুরন্ত টান। একজন মেধাবী ফুটবলার হিসেবে কৈশোরে কুড়িয়েছিলেন অসামান্য খ্যাতি। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলাগুলোতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান নিয়মিত পুরস্কৃত হতেন।

১৯৩২/১৯৩৩

শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ বছর বয়সে শেখ ফজিলাতুন্নেসা (রেনু)-কে বিয়ে করেন। তাঁরা দুই কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা এবং তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল এর জনক-জননী।

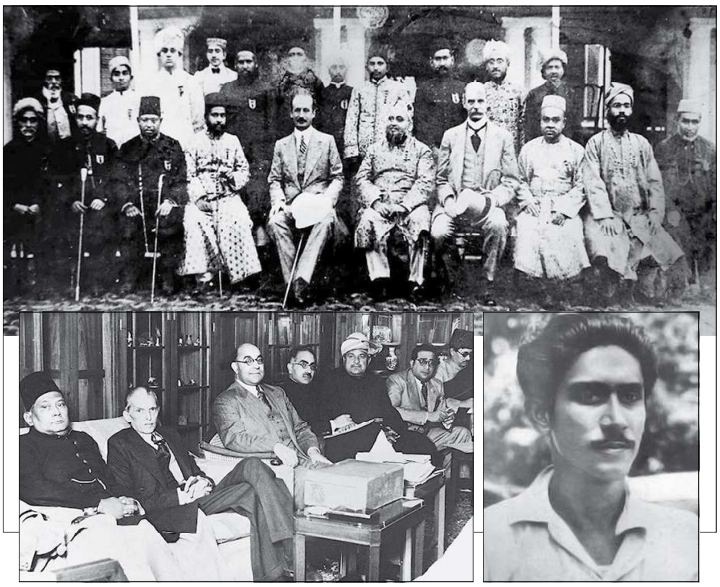

১৯৪৩

শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের (অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের শাখা) কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব প্রশংসার সাথে পালন করেন।

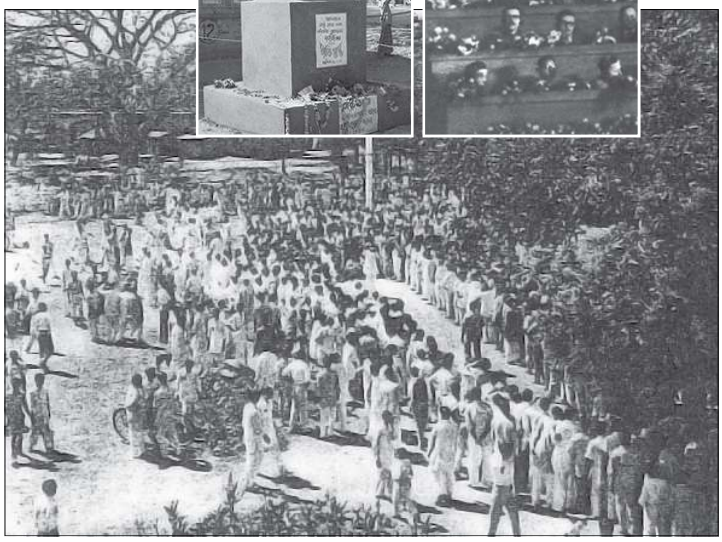

১৯৫২

২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেন, "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শেখ মুজিবুর রহমান জেলের ভেতরেই টানা ১১ দিন ধরে আমরণ অনশন চালিয়ে যান এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট আহ্বান করে। আন্দোলনরত ছাত্র জনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল নিয়ে অগ্রসর হলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর সহ আরো অনেকেই। এই বছর শেখ মুজিবুর রহমান শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে চীন সফর করেন। শান্তি সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় বক্তৃতা দেন, ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে যান বৈশ্বিক অঙ্গনে।

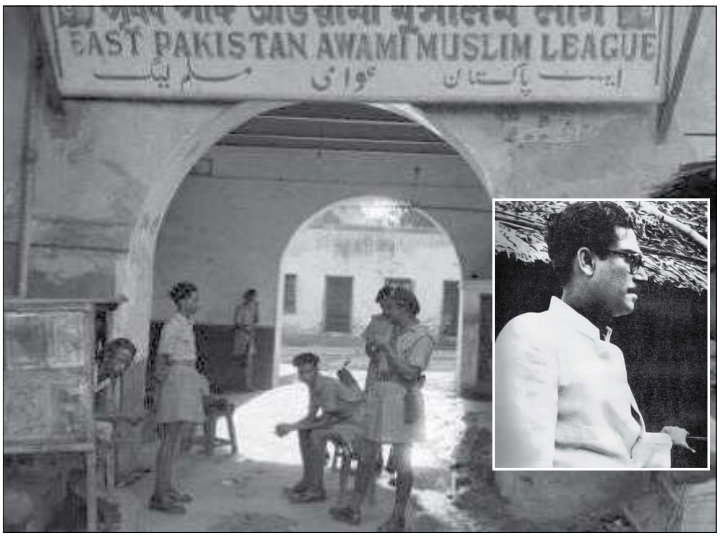

১৯৫৩

শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং একজন বাঙালি নেতা হিসেবে তাঁর গৌরবময় উত্থান ঘটে।

১৯৫৪

১০ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ একাই ১৪৩টি আসনে জয়ী হয়। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৫ মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ৩০ মে ভারত স্বাধীনতা আইন- ১৯৪৭ প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার হঠাৎ করে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান করাচি থেকে ঢাকায় পদার্পণ করা মাত্রই গ্রেফতার হন। ২৩ ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

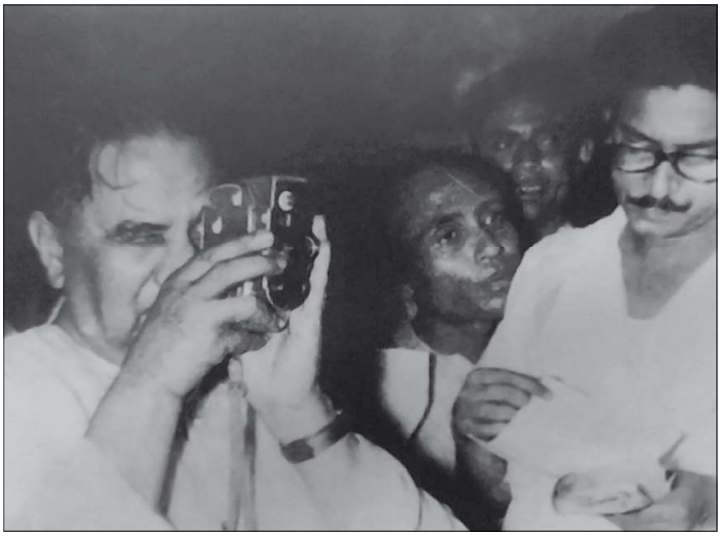

১৯৫৫

সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সব ধর্মের মানুষের অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করে নাম রাখা হয় 'আওয়ামী লীগ'। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৬৬

শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবিত ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এই ছয় দফা মুক্তিকামী বাঙালি জাতির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির বীজ বুনে দেয়, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ায় আঘাত করে। ১৮-২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল মিটিং-এ শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি সারা বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেন। এ সময় তাঁকে আটবার গ্রেফতার করা হয় এবং সর্বশেষ ৮ মে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। প্রায় তিন বছর তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন।

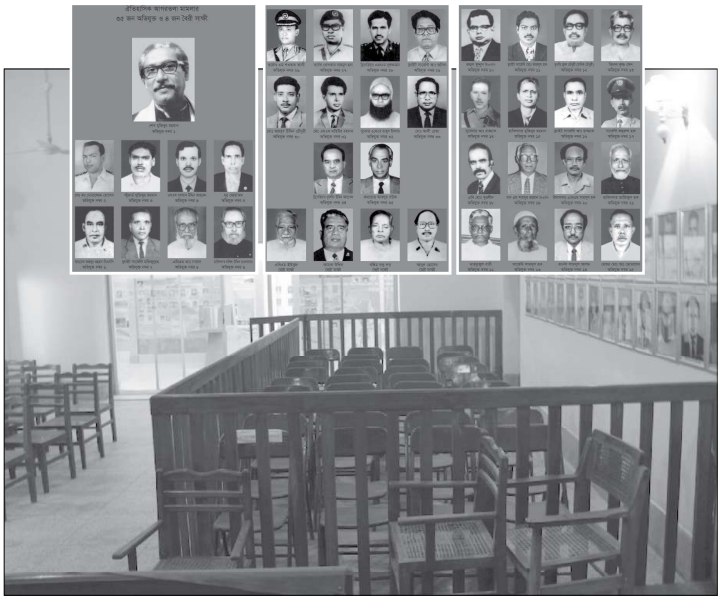

১৯৬৮

৩ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার মোট ৩৫ জন বাঙালির (রাজনীতিবিদ, সামরিক কর্মকর্তা ও সরকারি অফিসার) বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। জেলে বন্দী থাকা অবস্থাতেই ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের উপর পুনরায় গ্রেফতার আদেশ জারি করা হয়। ভারতের সহায়তায় পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে ১ নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' মামলা দায়ের করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে গণবিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকাজ শুরু হয়।

১৯৭০

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার আলোকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের জন্য তিনি নৌকা প্রতীক বেছে নেন। ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় উপকূল এলাকায় লাখো মানুষের প্রাণহানি ঘটে। বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী প্রচারণা স্থগিত রেখে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছুটে যান। ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়ী হয়। জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশে ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮ টি আসনে (সংরক্ষিত ১০ টি নারী আসনসহ) আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে।

১৯৭১

১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরুর মাত্র দুই দিন আগে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে সর্বস্তরের বাঙালি জনতা রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নতুন মোড় নেয়। ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধু কার্যত ছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান। একদিকে রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়ার নির্দেশ যেত, অপর দিকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে যেত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এই ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেদিনই তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে লন্ডন যাত্রা করেন। ৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে দেখা করেন। ঢাকায় ফেরার পূর্বে তিনি নয়াদিল্লীতে কিছুসময় অবস্থান করেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিমান বন্দরে সাদর অভ্যর্থনা জানান। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ফিরে আসেন।

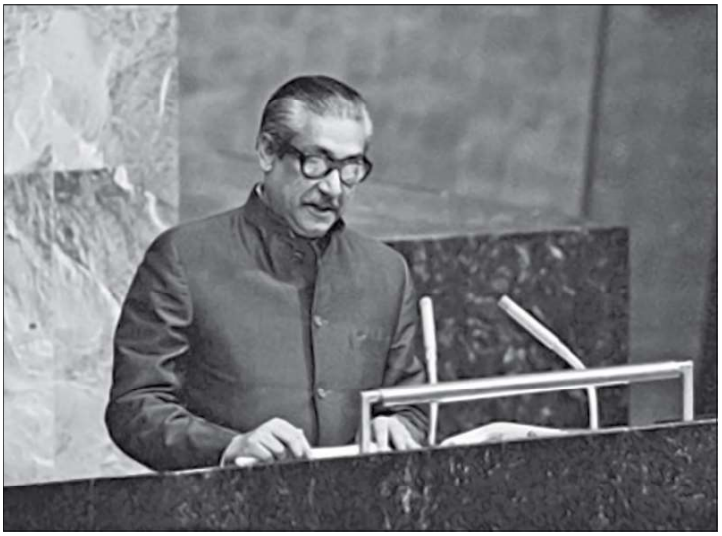

১৯৭৪

২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ পরিষদের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তব্য রাখেন। এর মাত্র সাতদিন আগে, ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে ১৩৬তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৭৫

১৫ আগস্টের ভোরে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী ও উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্ধকারতম দিন। বাঙালি জাতি এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে এবং সাথে সাথে স্মরণ করে বিশাল হৃদয়ের সেই মহাপ্রাণ মানুষটিকে যিনি তাঁর সাহস, শৌর্য, আদর্শের মধ্য দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন বাঙালি জাতির অন্তরে।

ইয়াহিয়া ভাই স্মরণে

জাকির হোসেন

গত ২২ আগস্ট, ২০২০ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সিদীপ-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ইন্তেকাল করেছেন। ইয়াহিয়া ভাই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন। শুনেছিলাম প্রায় এক সপ্তাহ ধরেই তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। ৭০-এ পা দিয়েছিলেন তিনি। করোনায় আক্রান্ত হয়ে এই বয়সের একজন মানুষের লাইফ সাপোর্টে যাওয়ার সংবাদ মনে আশংকার জন্ম দিয়েছিলো। তারপরও আশা করেছিলাম তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন, দেশের উন্নয়নে আবারও নিজেকে নিয়োজিত করবেন। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না। সবাইকে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন তিনি।

ইয়াহিয়া ভাই কর্মজীবনের শুরুতে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে যোগ দেন বেসরকারি সংস্থা প্রশিকায়। দীর্ঘ ৯ বছর কাজ করেন এখানে। ইউএনডিপিতেও কাজ করেছেন পাঁচ বছর। ফলে এই সেক্টরে বেশ সুখ্যাতি ছিলো তার। এরই ধারাবাহিকতায় ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-সিডিএফ এর প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯৬ সালে। ১৯৯৭ সালে গ্রামীণ ট্রাস্টে যোগ দেয়ার আগ পর্যন্ত এ দায়িত্বে ছিলেন এক বছর। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিডিএফ-এর গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি। অত্যন্ত বিনয়ী, প্রচারবিমুখ ও মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন আমাদের প্রিয় ইয়াহিয়া ভাই। প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে ১৯৯৫ সালে নিজ জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন উন্নয়ন সংস্থা "সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস-সিদীপ।" সত্যিকার অর্থেই উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী ছিলেন তিনি। গত ২৫ বছরে দেশের প্রান্তজনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মান উন্নয়নে তার সংস্থা সিদীপের ভূমিকা ও সাফল্য দেখলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় এ কথা। ইয়াহিয়া ভাইয়ের মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যিকারের উন্নয়ন চিন্তাবিদকে হারালো।

ইয়াহিয়া ভাইয়ের প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সিদীপ এখন দেশের ১৮টি জেলায় প্রায় দেড় লাখ দরিদ্র পরিবারকে ঋণ সহায়তা ও ৮০ হাজার সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে গৃহশিক্ষা প্রদান করছে। "মডার্ন স্কুল" নামেও একটি কর্মসূচি আছে সিদীপের। দেশের ৭টি জেলায় ২০টি শাখার মাধ্যমে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরিচালিত হয় এই এগুলো। ইয়াহিয়া ভাই স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন ২০১৩ থেকে। সারা দেশে ৩০টি কেন্দ্র থেকে সেবা দেয়া হচ্ছে এই কর্মসূচির আওতায়।

আমি আশা করবো, সিদীপের মাধ্যমে যে মহৎ কার্যক্রম তিনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তার মৃত্যুতে সেটা থমকে যাবে না। পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা তার কার্যক্রম ও উন্নয়ন চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি ইয়াহিয়া ভাইয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।■

● নির্বাহী পরিচালক, বুরো বাংলাদেশ

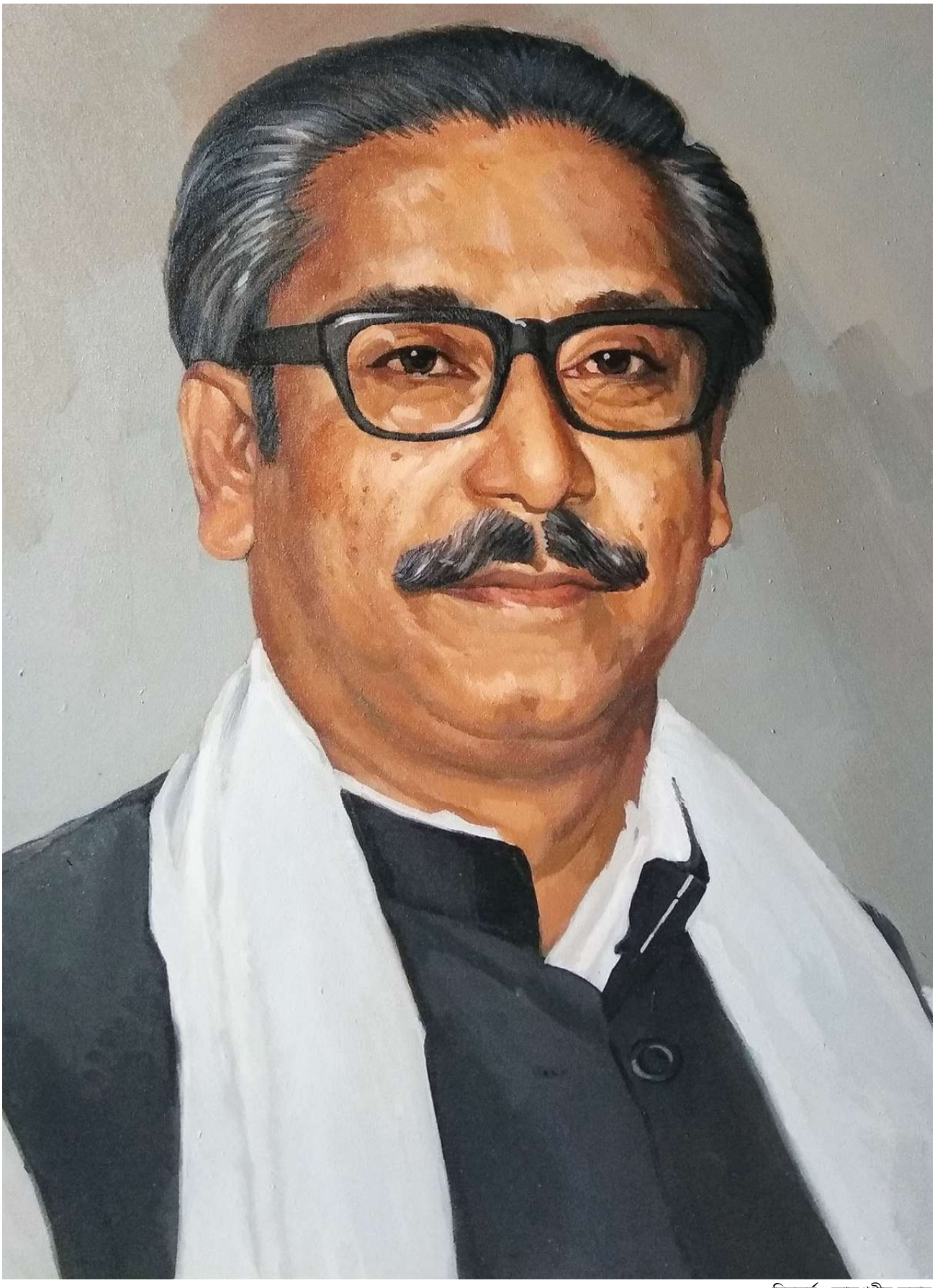

চিত্রকর্ম : আলপ্তগীন তুষার

প্রত্যয় সাহিত্য

কবিতা

এই সিঁড়ি
রফিক আজাদ

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে–
বত্রিশ নম্বর থেকে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন,
আয়ত দু'চোখ ছিল পাখির পিয়াসী
পাখি তাঁর খুব প্রিয় ছিল–
গাছ গাছালির দিকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখ তুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন,
পাখিদের শব্দে তাঁর, খুব ভোরে, ঘুম ভেঙ্গে যেতো।
স্বপ্ন তাঁর বুক ভরে ছিল,
পিতার হৃদয় ছিল, স্নেহের আর্দ্র চোখ–
এ দেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র
তাঁর চোখে মূল্যবান ছিল–
নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিল;
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে
বিশাল শরীর...
তাঁর রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ
তাঁর ছায়া দীর্ঘ হতে হতে
মানচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে
তাঁর রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে–
তাঁর রক্তে সবকিছু সবুজ হয়েছে।

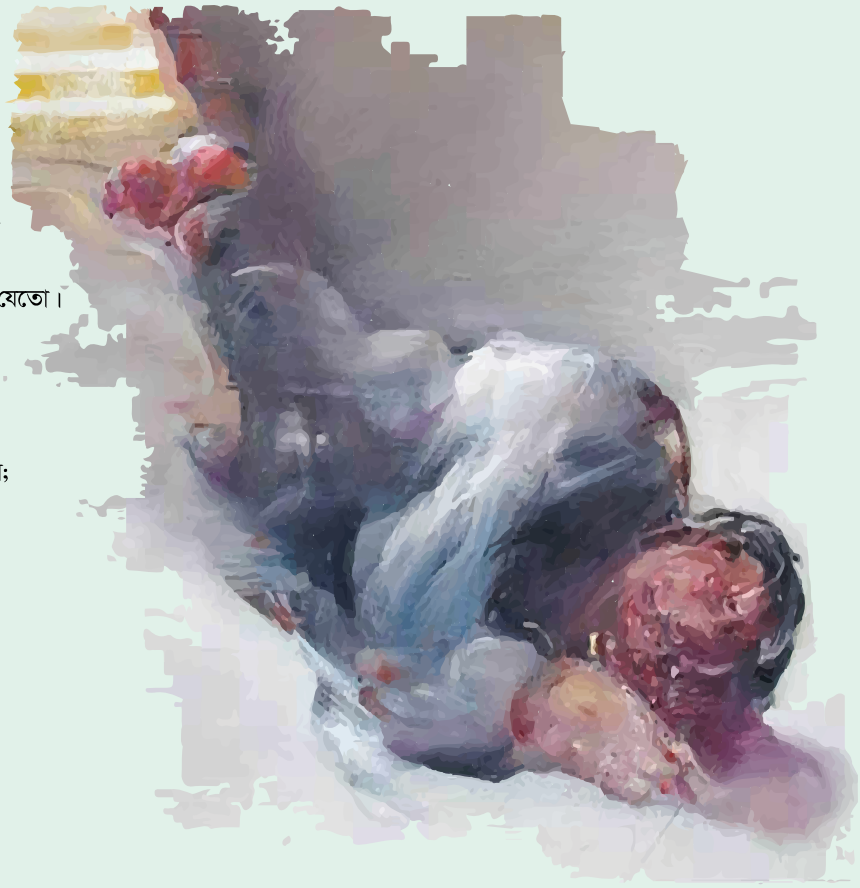

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিঁড়ি ভেঙ্গে রক্ত নেমে গেছে–
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।

আমাদের রাজকুমার ও বাংলাদেশ

অসীম সাহা

তোমরা আমাকে কেউ স্বাধীনতার গল্প শোনাতে এসো না
তোমরা কেউ শোনাতে এসো না ৭ই মার্চের অগ্নিঝরা বিকেলে
কী করে গর্জমান ঢেউয়ের ভেতর থেকে উত্থিত হলো একটি
অবিনাশী কণ্ঠস্বর;
আর আকাশ ফাটানো বজ্রের হুংকারে কেঁপে উঠলো পৃথিবীর মাটি;
লক্ষ-লক্ষ মানুষের বাঁধভাঙা মিছিলে ডুবে গেলো
ঢাকার সমস্ত পথঘাট, রাজপথ, রমনার সম্পূর্ণ উদ্যান;
সকলের কণ্ঠে-কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হলো একটিমাত্র
অবিনাশী শ্লোগান, 'জয় বাংলা'!
তাদের হাতে নানা রঙের, নানা বর্ণের তীক্ষ্ণ হাতিয়ার,
মনে হলো, বিসুভিয়াসের ভয়ংকর লাভা থেকে উদ্গীরিত
অগ্নিশিখা অকস্মাৎ গিলে ফেলবে সম্পূর্ণ পৃথিবী।

অপেক্ষার ক্লান্তি নেই, অগ্নিদগ্ধ পাঁজরে দাউ-দাউ জ্বলছে আগুন
ঠিক তক্ষুনি লক্ষ কণ্ঠের উদ্দীপ্ত শ্লোগানে-শ্লোগানে
ভরা সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিমায়
মঞ্চে উঠে এলেন আমাদের প্রিয় এক দৃপ্ত রাজকুমার।
গায়ে তাঁর সফেদ পাঞ্জাবি, পরনে চির শুভ্র পায়জামা,
আর সারা শরীরে আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে থাকা দীপ্ত কালো কোট।
ব্যাকব্রাশ চুল, মুখে সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা,
মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন যেই,
সঙ্গে-সঙ্গে সম্পূর্ণ ময়দান কাঁপিয়ে লক্ষ-লক্ষ মানুষের
গগনবিদারী চিৎকারে মুখরিত হয়ে উঠলো বাংলার আকাশ-বাতাস।

তারপর শান্ত নদীর মতো নিঃস্তব্ধতা নেমে এলো মার্চের বিকেলের মাঠে।
একটি কণ্ঠ থেকে কী গান আসবে ভেসে–সে-রকম প্রতীক্ষায়
কেটে যাচ্ছে নিঃশব্দ প্রহর,
সংশয়ে দুলে উঠছে প্রাণ, অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে চোখ;
সেই মুহূর্তে প্রিয়তম বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হলো
সেই মর্মভেদী বাণী :
"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
তখন থেকেই আমরা মুক্ত হলাম, তখন থেকেই
স্বাধীনতা শব্দটি আকাশ-পাতাল, পৃথিবী এবং সৌরমণ্ডল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেলো ২৬শে মার্চের মধ্যরাতের দিকে,
অতঃপর নয় মাস যুদ্ধশেষে পৃথিবীর মানচিত্রে
সূর্যোদয়ের মতো ফুটে উঠল
নতুন এক স্বদেশের নাম : বাংলাদেশ
বাংলাদেশ
বাংলাদেশ।

কোটি মানুষের অনুভবে

কামাল চৌধুরী

লাল পলাশের আকাশ দিয়েছ উড়িয়ে
পতাকা দিয়েছ কাদামাটি আর সবুজে
ঠিকানা দিয়েছ, জন্মের জয়ধ্বনি
উন্নত শির, মহাকালে তুমি তূর্য।

ইতিহাসে দেখি প্রতিটি পাতায় তোমাকে
রোদ বৃষ্টিতে স্মৃতি সত্তায় দাঁড়িয়ে
মুজিব মিনারে, অতি উজ্জ্বল আলোতে
তারারা এসেছে তোমারই গল্প শোনাতে

সেখানে আমার কিশোরবেলার স্মৃতিরা
হাজার বছর পায়ে হেঁটে হেঁটে আসছে
পদতলে মাটি লাল হয়ে গেছে রক্তে
কত মৃত্যুর পরে মাথা উঁচু স্বপ্ন।

মানুষ আসছে, মিছিল আসছে পেছনে
মানুষ আসছে, মুজিবের ডাকে আসছে
স্বাধীনতা চাই, প্রতিরোধ গড়ে ঐক্য
তুমি জাগরণ, তুমি স্বজাতির বন্ধু।

তোমাকে দেখেছি, মানবিক, দ্রোহী, সাহসী
তুমি বাংলার তর্জনি উঁচু মহিমা
তুমি ডাক দিলে দেশ হয়ে যায় জনতা
মানুষেরা জাগে, আঁধারবিনাশী যুদ্ধে।

শৃংখল থেকে মুক্তির তুমি দিশারী
ভাটিয়ালি গানে হাওয়া লাগা পালে আগামী
মধুমতি থেকে পদ্মার জলে, ভাসানে
তুমি জেগে আছ নদী-মাতৃক চরণে।

আমারও কবিতা নিবেদন করি তোমাকে
তোমার মৃত্যু কোথাও যে দেখি না আমরা
অশ্রু ও শোক, রক্তের স্রোত পেরিয়ে
কোটি মানুষের অনুভবে আছো জীবিত।

আর্তস্বরের ভেতর

গোলাম কিবরিয়া পিনু

যে বুকে আশ্রয় পেয়েছিলাম আমিও
সেই বুকে গুলি!
আমি তো কিছুই করতে পারিনি,
বহন করেছি শুধু শোকগাথা
শুধু শোকতাপ,
আকুলিবিকুলি উথালপাথাল!
শোকপ্রবাহে ডুবেছি–
কী ত্রিতাপে আমারও সপ্তপাতাল!

মর্মভেদী কান্না দিয়ে তৈরি হলো
বাঙালির কী বিষাদময় ইতিহাস!
শোকদগ্ধ হয়ে এখনো আমরা
কাতর ও মুহ্যমান,
আগষ্ট তো শেষ না হওয়া শোকের গান!

অশ্রুলোচনের ভেতর আমি ও তুমি
এই জন্মভূমি!
পরিবেদনা ও আর্তস্বরের ভেতর
আমাদের এই জেগে থাকা,
মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর স্বপ্ন
চিরদিন রাখা।

মৃত্যুই শেষ নয়

কুশল ভৌমিক

মৃত্যুই শেষ নয়
তবুও বারবার মৃত্যুতেই দেখেছিলো শেষ ওরা
সেই বিষণ্ন ভোরে ৩২ নম্বরের সিঁড়ি দিয়ে
গড়াতে গড়াতে রক্ত নয় একমুঠো দীর্ঘশ্বাস
কী নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়লো বাংলার বাতাসে।

কোনো কোনো পতন হয় শব্দহীন
হেমন্তের বাতাসে ঝরা পাতার মতোন
কেবল নিঃসঙ্গ বৃক্ষটাই জানে
পত্রপুষ্পহীন বেদনার নিগূঢ় কাহন।

মৃত্যুই শেষ নয়
ফিনিক্স পাখির মতো মৃত্যুঞ্জয়ী
জন্ম নেয় শত শত বার।

বুক যার হিমালয়, নিঃশ্বাসে স্বপ্ন আঁকে বিস্তীর্ণ বাংলার
মৃত্যুর কি সাধ্য আছে এঁকে দেবে শেষ চিহ্ন তার?

প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

মারুফুল ইসলাম

তাঁর কথা আজও বাঁশবনে রূপকথার জোনাকি
বেদনার ভরা পাল বিষাদের নদীপথ ধরে যেতে থাকে
আনন্দের মোহনায়
ওখানে সমুদ্র বাড়িয়ে রেখেছে তার দু বাহু
মলিন হতে থাকা রাশি রাশি বর্ষপঞ্জিকার বিপরীতে
তিনি হতে থাকেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতম

ছায়াপথে তাঁর যত আয়োজন
আমি প্রাতিস্বিক পরিভ্রমণে দেখি চলমান ছবি
আঁকি তাঁর আর সোনার বাংলার মুখচ্ছবি

কস্মিনকালেও হৃদয় করে না বিশ্বাসঘাতকতা
পকেটে পরশপাথর নিয়ে নিরাপদ নিদ্রায় স্বপ্ন বোনে শিশু
নারীরা ধ্রুপদী সঙ্গীত হয়ে বেজে ওঠে সেতারে সরোদে
ধানখেতে পাক খায় বাউকুমটা বাতাস

যে ছবি আমরা পেয়েছি তাঁর কাছে
তার রঙ ছেয়ে থাকে পার্থিব আকাশে
চিত্রকর তিনি অপার্থিব
না, নির্বাসনে নয়
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে

একটা তর্জনীর সাহসে

ফেরদৌস সালাম

একটা তর্জনীর সাহসেই জন্ম নেয় বিশ্ব ইতিহাস
বুকের জমিন হয়ে ওঠে স্রোতস্মান পদ্মা মেঘনা যমুনা।
কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হয়–
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু-শ্লোগানের ধ্বনি
কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র স্বাধীনতার পলি মেখে
প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর মুক্তির গর্জন
অলিগলি গাঁয়ে গঞ্জে গর্জে ওঠে প্রতিবাদী বারুদের মুখ
রামগতি থেকে তেঁতুলিয়া– জেগে ওঠে প্রতিটি মানুষ
যার যা কিছু ছিলো তাই নিয়ে নেমে এলো ময়দানে
দেশপ্রেমে উজ্জীবিত নারী হাতের মেহেদি মোছার আগেই
জীবনসঙ্গীকে অনুমতি দিলো যুদ্ধে যেতে
মা সন্তানকে বললো এখন সময় নয় আঁচলে থাকার
সাহসে সাহসে যুদ্ধে যায় হাজার রুমী
ঘরের মাচায় ছটফটাতে থাকে রঙিন ঘুড়িরা
চিমনির ধোঁয়া মাখা কলের শ্রমিক-লাঙল প্রেমিক
স্কুল পালানো কিশোর প্রত্যেকের কণ্ঠেই তখন
জয় বাংলার ব্যাঘ্র হুঙ্কার প্রকম্পিত হতে হতে
ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশে– বিশ্ব থেকে মহাবিশ্বে
হায়েনার কারাগারে বন্দী মুজিবকে প্রধান করেই
বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে গঠিত হয় প্রবাসী সরকার
সারাবিশ্ব জানে স্বাধীনতার জন্যে এই যুদ্ধ
পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত হতে এই যুদ্ধ–
গেরিলার দাবানলে পুড়তে থাকে হানাদার বাঙ্কার
টেকনাফ থেকে জাফলং– পাকিস্তানী হায়েনারা
ক্রমশই ভীত হয়ে ওঠে
কাদেরিয়া বাহিনীর ক্যাচকা মাইরে কসাই টিক্কাও
বুঝে যায় এই মানচিত্র তার নয়...
জাহাজমারা হাবিবের সাহসিকতায় ঘুরে যায় যুদ্ধের মোড়
যুদ্ধ জয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠে কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা।
কবিতা রেখে মাহবুব সাদিক হাতে নেন রাইফেল
শহীদ হাতেমের ফিনকি দেয়া রক্ত দেখে
সহযোদ্ধা বুলবুল খান মাহবুব লিখে যান অদম্য কবিতা
রফিক আজাদের স্টেন থেকে উদ্গিরত হতে থাকে
বিষবৃক্ষের ঘৃণা... পালায় পালায় পাকিরা পালায়...
আত্মসমর্পণ দলিলে সই করেন বন্দি নিয়াজী
এভাবেই যুদ্ধে যুদ্ধে মুক্তি ঘটে ধর্ষিত মৃত্তিকার
জন্ম নেয় বাংলাদেশ– মাথা উঁচু করে
পতাকা উড়িয়ে গাই 'আমার সোনার বাংলা'
আমি তোমায় ভালবাসি...

রত্নপ্রভা কিংশুক ফুটে আছে

আবু ফজল নূর

আদি যুগ হ'তে তোমার পায়ের চিহ্ন
শ্যামল ছোঁয়া প্রকৃতি বাঙলা'র জনপদ
যুগ শতাব্দী'র প্রদৃপ্ত মৃত্তিকা বুকে
অহোরাত্র স্নেহ শূন্য, তোমার নগর গাঁয়ে বসত বাড়ি!
নিরানন্দ পুষ্পোদ্যান, নিরন্তর ঝরে পড়ে শোকের শিশির
শাশ্বত প্রত্যুষে হৃদ স্পন্দনে ছড়ায় শোক, ময়ূখ প্রত্যয়
প্রকৃতি খোঁজে তোমার দ্যুতিমান পুষ্প অবয়ব,
দিগ্ দিগন্তর কাঁদে, বিনিঃশেষ চোখে উঁকি দ্যায়
ধরিত্রী'র বুক, পূর্বাশা সূর্য সারথি দোলে,
নিঃসাড় নগর গাঁ, নিকষ কৃষ্ণ ছুঁয়ে যায়
মাধবী কুঞ্জ উদ্যান, বিমূঢ় ধরিত্রী মগ্নগিরি।

তোমার আঙুলে বসন্ত বিকেল, উত্তালতা সাত মার্চ,
পাহাড় পর্বত, জন সমুদ্রে বজ্র কণ্ঠ কেঁপে ওঠে আগ্নেয়গিরি,
অপরাজেয় আঁখরে কাব্যে স্বোপার্জিত মুক্তিযুদ্ধ
আমাদের স্বাধীনতা, দিগন্ত সুজেয় স্লোগান জয় বাংলা।
আমি অনন্ত নিসর্গে দাঁড়িয়ে বিবর্ণ চিত্তে
অপেক্ষা সময় পার হচ্ছি শোক অন্তরালে,
বাঙালী নিবাসে পবিত্র সিঁড়ি মাঝে তোমার পুষ্প দেহ,
শিমুল পলাশ রত্নপ্রভা কিংশুক ফুটে আছে
আমার মননে জাতির পতাকা, তুমি বঙ্গবন্ধু,
চেতনা গহিনে তুমি চিরায়ু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

ঋণ

রোকেয়া ইসলাম

প্রায় শেষ বর্ষার কৃষ্ণ গহ্বর অন্ধকারে হায়েনা উদ্ধত বুট পায়ে
এজিদ উত্তরসূরীরা ঘন ছায়ায় মৃত্যু সেজে এসেছিল বত্রিশ নম্বরের সিঁড়িতে
সেদিনের সেই গভীর রাতটা কেমন ছিল?
অনেক খুন তাই সিমেন্টের ফ্লোর উষ্ণ
সে ম্যালা প্রশ্ন...

যেখানে আমার নীলাভ আকাশ দৃঢ় হিমালয়, অথৈ সমুদ্র প্রদীপ্ত সূর্য,
অবারিত সবুজের মাঠ, অগণন দোয়েল সুর, আম-জনতার বিশ্বাস,
ভালবাসা আর পিতার রক্ত স্রোত একাকার
এসব জেনে আর কি দরকার?

পনেরোই আগষ্ট ভোরের বড্ড একা হয়ে যাওয়া,
শ্রাবণ ভেজা বেহালায় বেহাগ অনেকটাই বেসুরো
প্রভাত সূর্য আরো রক্তিম পিতার শুদ্ধ রক্তে নেয়ে
বাতাসে অনন্ত বিরহ বিষণ্ন গীতি
রেডিওতে রুটিনের তারবার্তা, অভ্যুত্থানের এই এক রীতি...

দুঃখী মানুষের শোষিত পক্ষের খাঁটি মানুষটি আর নেই
সমাধি সে অবধি ঠিকানা, এই গ্রহ পিতৃহারা,
আত্মভোলা বাঙালি- স্তম্ভিত মাটি, বায়ু, বঙ্গোপসাগর
কোথায় ওনাকে পাই?

মেঘে ঢাকা দৃষ্টি সীমানা আকুল অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে পাথর
সময়, কে তোমার পক্ষ?
সেনা ছাউনির ডিভোর্সি নাম পাওয়া যায়
বড়জোর মায়ের দ্বিতীয় স্বামী
বাবা নেই, ডাক নেই, কেউ নেই- সমকক্ষ...

স্মৃতির মিনার আজও ভালবাসার অবিরাম নুন
অবনত তোমার কাছে
জনক তুমিই স্বাধীনতা
আমার হাজার বছরের ডিএনএ রিপোর্টে তোমার খুন...

তবু রয়ে যায় অপরিশোধ বকেয়া জন্ম ঋণ
সেই কালো রাতটিই অবয়ব, বেঁচে থাকার সংশ্রব
স্পন্দিত বুকে এখানেই থামতে চাই
টুঙ্গিপাড়া বাস ষ্টেশন, আমাকে নামিয়ে দিন...

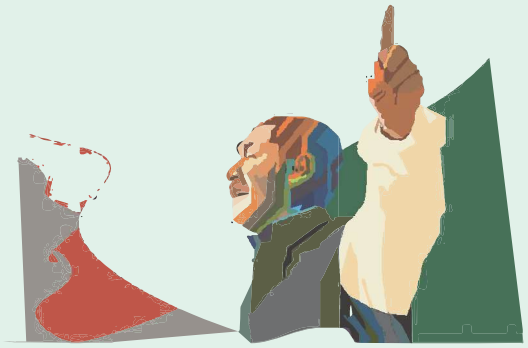

মৃত্যুর মধ্যেই যেন ফিরে পাই অনন্ত জীবন

রনি অধিকারী

আমাকে আশ্রয় দিও অসম্ভব স্বপ্ন হয়ে...
তোমার চিরনিদ্রায় প্রকৃতিরা অনুতপ্ত।
পায়ে হেঁটে, ঘুমের ভেতর রোদ ভেঙে, শিশির মাড়িয়ে-
ঠিকই-ঠিকই যাবো একদিন তোমার আশ্রমে।

শিশিরের ছলে শুধু রক্ত ঝরেছে, সারারাত–রাতভর
নক্ষত্রের আগুনশরীর থেকে অগ্নি ঝরেছে ক্রমশ-
ঝলসে যাওয়া দেহে অনাবিল আর্তনাদ...
দৃঢ় ভস্মে হতভম্ব দাঁড়িয়ে থেকেছি, স্রেফ একা;
দেখেছি তোমার মৃত্যু, অপলক নিদারুণ মৃত্যু...
ভয়ংকর অগ্নি সরোবরে।

একবার তোমাকে দেখতে যাবো অসম্ভব স্বপ্ন হয়ে
অসম্ভব স্বপ্ন হয়ে। আমাকে আশ্রয় দিও...
আমাকে আশ্রয় দিও।

তোমাকে দেখবে বলে

রানা হমিদ

তোমাকে দেখবে বলে পথে পথে মানুষের সেই জনস্রোত
মাটির ব্যাংক ভেঙে স্কুল পালানো মানিকও কেটেছে
লোকাল বাসের টিকেট,
বাস থেকে নেমে সেও আসবে রেসকোর্স ময়দানে।
তোমাকে দেখবে বলে ছেউরিয়া থেকে একদল বিপ্লবী বাউল
চড়েছিল ট্রাকে।
পথে পাক-পুলিশের নির্যাতনে রক্তাক্ত হয়েও ওরা থামেনি,
তোমাকে দেখবে বলে রাতভর নেতা কর্মীদের নির্ঘুম পাহারা
যেন মুক্তির দূত তুমি তোমাকে দেখবে খুব কাছ থেকে
তোমাকে দেখবে বলে উন্মুখ হয়ে ছিল এ আকাশ
তোমাকে দেখবে বলে শ্রমিকেরা প্রতিটি কলকারখানায় ঝুলিয়েছিল তালা,
জেলগেটের সামনে যারা তোমার মুক্তির দাবিতে জড়ো হয়ছিল–
তারাও ছিল প্রতীক্ষার লাইনে দাঁড়িয়ে
যেমনটি সেদিনের সূর্যও অপেক্ষায় ছিল তোমাকে দেখবে বলে
তোমাকে দেখবে বলে সেদিন জনারণ্যে প্রেমিকারা ছেড়েছিল
প্রেমিকের হাত
তোমাকে দেখবে বলে সেদিন মাঠের কৃষক
সবুজের সুশোভন মায়া ছেড়ে এসেছিল বিদ্রোহের এ পাললিক প্রান্তরে
তোমাকে দেখবে বলে মাঠ ঘাট নদীপথ শহর বন্দর হেঁটে এসেছিল...

তোমার মুখের দীপ্ত আভায় দেখেছিল ওরা মুক্তির বর্ণচ্ছটা,
সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা তোমার গৌরবে আমাদের বুকে
দীপশিখা হয়ে জ্বলে।

ছোটগল্প

বাঁশিওয়ালা

রাশেদ রহমান

আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। আবিদ, কাদের, শাহেদ আমার সহপাঠী। দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। স্কুল বন্ধ। লেখাপড়ার চাপ নাই। হাতে অফুরন্ত সময়। আমরা চার বন্ধু সারাদিন টো-টো করে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই। বসন্ত সেনের পোড়োবাড়ি আমাদের প্রিয় জায়গা। দিনের বেশিরভাগ সময় আমাদের এই বাড়িতেই কাটে। সাধারণত মানুষজন কেউ এখানে আসে না। সাপ-খোপের ভয় আছে। ভূত-প্রেতের গল্প আছে বাড়িটিকে ঘিরে। তারপরও আমরা আসি। আমাদের বয়স কেবল তেরো-চৌদ্দ। এই বয়সের বালকদের ভয়-ডর কম। আমাদের মধ্যে আবিদ সামান্য ভীতু প্রকৃতির। সেনবাড়িতে ঢোকার সময় ওর গা নাকি ছমছম করে। কিন্তু আমাদের সাথে থাকে তো; শেষ পর্যন্ত ভয়-ডর জয় করে সেনবাড়ির ভেতরে ঢোকে...।

বসন্ত সেনের পোড়োবাড়িতে প্রচুর গাছপালা। আম, জাম, আমলকি, জারুল, লিচু, চালতা– রাজ্যের ফলগাছ তো আছেই, বট-পাকুড়, নিম-কড়ই, শিরীষগাছও আছে। বাড়িটি বহুদিনের পুরনো। গাছগাছালির ভেতরে ভাঙা দালান। বসন্ত সেনের দাদু বা পরদাদু হয়তো দালানটি তুলেছিলেন। সেনবাড়ির লোকেরা, দাদার মুখে শুনেছি, ১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় ইন্ডিয়া চলে গেছে। শুধু সেনরাই নয়, গাঁয়ের আরো অনেক হিন্দু তখন দেশ ছেড়েছে। কলকাতায় যেমন মুসলমানদের নিরাপত্তা ছিল না, তেমনি এখানে হিন্দুদের নিরাপত্তা ছিল না। দাদার মুখেই শুনেছি এসব। যা হোক, এই দালানের ভেতরে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে আমরা আড্ডাখানা গড়ে তুলেছি। আমরা প্রতিদিনই এখানে আসি। সাপ-লুডু খেলি। গাঁয়ের ছোট কিংবা বড়ো– কেউই আমাদের এই আড্ডাখানার খোঁজ জানে না। ভূতের বাড়ির খবর কে রাখতে যাবে? তাছাড়া দেশের যে পরিস্থিতি, বলা তো যায় না কখন কী ঘটে...!

আমাদের বয়স কম; দেশে কেন অসহযোগ আন্দোলন চলছে, কেন বড়োরা বলাবলি করে দেশের পরিস্থিতি খুব খারাপ, যুদ্ধ লেগে যেতে পারে দেশে– এইসব ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নাই। ভাসা-ভাসা কিছু জানি। অরুণ স্যার একদিন ক্লাসে কিছুটা বলেছেন। স্কুল বন্ধ না-হয়ে গেলে হয়তো স্যার আরো বলতেন। তবে, আবিদ, কাদের, শাহেদের চেয়ে আমি কিছুটা বেশি জানি। দাদার মুখে শুনেছি। দাদা রাজনীতি করে তো, শহরের বড়ো বড়ো নেতাদের সাথে তার ওঠাবসা। নেতারা গ্রামে এলে আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নেন। মোয়া-মুড়ি খান। দাদার মুখেই বঙ্গবন্ধুর নাম প্রথম শুনি। দাদা বলেছে, অরুণ স্যারও একদিন ক্লাসে বলেছেন– বঙ্গবন্ধুর ডাকেই দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। অসহযোগ মানে অসহযোগিতা। অর্থাৎ সরকারের কোনো কাজে সহযোগিতা না-করা। হরতাল-ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকারের অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করা। দাদা বলে– পাকিস্তান সরকার ২৪ বছর ধরে শাসনের নামে আমাদের শোষণ করছে। এতো অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন-বঞ্চনা সহ্য করে আর একসাথে থাকার সুযোগ নাই। এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্বপাকিস্তান একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ হয়ে যাবে। আর তা হতে খুব বেশি দেরিও নাই...।

আজ সকালে রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছি। গতকাল ঢাকার বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। দাদা বললো– বঙ্গবন্ধুর ভাষণ রেডিওতে সরাসরি প্রচার করার কথা ছিল। সব প্রস্তুতিও নিয়েছিল রেডিও'র লোকেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জুলুমবাজ সরকার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সরাসরি প্রচার করতে দেয় নাই। এই কারণে রেডিও'র বাঙালি লোকজন ধর্মঘট করেছিল। সরকার বাধ্য হয়ে আজ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করে...।

গাঁয়ে আমাদের বাড়িতেই শুধু রেডিও আছে। থ্রিব্যান্ড রেডিও। ছোটখাটো একটা বাক্সের মতো। দাদা আগেই জানতো আজ সকালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা হবে। ভাষণ শোনার জন্য গাঁয়ের মুরুব্বিদের সে দাওয়াত দিয়েছিল। প্রতিবেশীরা তো আছেই। দাদি উঠানে খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে দিয়েছিল। মাঝখানে রেডিও রেখে আমরা সবাই গোল হয়ে বসেছিলাম...।

বাপরে বাপ! বঙ্গবন্ধুর গলায় কী যে জোর! মনে হচ্ছিল– রেডিও যেন ফেটে যাবে...।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' – বলে বঙ্গবন্ধু ভাষণ শেষ করেন। আর ভাষণ শেষ হতেই দাদাও 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে উঠলো। বললো– দেখলি তো শরীফ, বঙ্গবন্ধু বললেন– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি বলেছিলাম না– দেশ স্বাধীন হতে আর খুব বেশি দেরি নাই। উপস্থিত মুরুব্বিরাও দাদার কথায় সায় দিল। দাসবাড়ির নকুল দাদু বললো– 'শ্যাখ সাব একজন বাপের ব্যাটা। ঠ্যালা বুঝবো এইবার, ইয়াহিয়া খান...।'

দাদুর চোখ-মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছিল। আমি চোখের পলক না ফেলে দাদুর দিকে তাকিয়ে রইলাম...।

আবিদ আমার সাথেই ছিল। আমাদের বাড়ি পাশাপাশি। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর আসর ভাঙলে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। সেনবাড়ি যাবো। সেনবাড়ি যেতে গাঁয়ের খাল পার হতে হয়। এখন মার্চ মাস। খালে পানি নাই। কাদের আর শাহেদের খালপাড়ে চালতাতলা দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আমাদের আর আবিদদের বাড়ি পশ্চিমপাড়া। কাদের-শাহেদের বাড়ি পূর্বপাড়া। সেনবাড়ি গাঁয়ের একেবারে উত্তর পাশে, পৌলির কাছাকাছি। আমরা খালপাড়ের চালতাতলা মিলিত হই। তারপর বসন্ত সেনের পোড়োবাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করি। এটাই যেন আমাদের নিয়ম...।

কাদের-শাহেদ সাধারণত আমাদের আগেই চালতাতলা আসে। আজ আমরা দু'জন সেখানে পৌঁছে দেখি ওরা তখনো আসেনি। শুনেছিলাম কাদেরের মায়ের অসুখ। খুব সম্ভব টাইফয়েড হয়েছে। গালার পলান ডাক্তার তাই নাকি সন্দেহ করছে। আজ জ্বর আবার বাড়লো কিনা, এই কারণেই ওদের দেরি হচ্ছে কিনা, কে জানে...!

আমরা দু'জন চালতাগাছের গোড়ায় বসলাম। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে...।

আমার মাথায় কাদেরের মায়ের জ্বর। সত্যি সত্যি টাইফয়েড হয়ে গেলে বিপদ। ছুনু চাচা গরিব মানুষ। চাচির ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারবে না। আমি ভাবছি– দাদিকে বলে কিছু টাকা-পয়সা দেয়া যায় কিনা। দাদির মনটা খুব নরম। কারো অসুখ-বিসুখ বা কোনো বিপদের কথা শুনলে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে। এসব ভাবনার মধ্যেই ঘটনাটা ঘটলো...।

কে যেন কাছাকাছি কোথাও বাঁশি বাজাচ্ছে। একেবারে উথালপাথাল করা সুর। সম্ভবত আড়বাঁশি। পালবাড়ির অষ্টপ্রহরে বগুড়ার এক কীর্তনিয়াকে আড়বাঁশি বাজাতে দেখেছি। লোকটি কৃষ্ণ সেজেছিল। মন কী-রকম আকুল-করা সুর যে বাঁশিতে তুলছিল লোকটি! আমার কানে অনেকদিন সেই সুর বেজেছে। আজও সেরকম বাজছে কানে। কিন্তু আজ তো কোথাও অষ্টপ্রহর নাই। তাহলে...!

এই আবিদ, কিছু শুনছিস? আমি আবিদকে জিজ্ঞেস করলাম...।

আমার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিটা স্বাভাবিক ছিল না। আমাকে হয়তো অস্থির দেখাচ্ছিল। তাই আমার প্রশ্ন শুনে আবিদ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। কোনোমতে ঢোক গিলে বললো– কী শুনবো...?

বাঁশির সুর। কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে...।

এবার হাসি ফুটে উঠলো আবিদের চোখে-মুখে। আমি যেন বোকার মতো একটা প্রশ্ন করেছি। কোথায় বাঁশির সুর? কে বাঁশি বাজাচ্ছে? আবিদ বললো– কই, নাতো। কোত্থেকে তোর কানে বাঁশির সুর বাজে? ভুল শুনেছিস...।

না। ভুল শুনিনি। আমার কানে এখনো বাঁশির সুর বাজছে। ওই সুর যেন আমাকে ডাকছে– আয়, আয় শরীফ, শিগ্‌গির ছুটে যাই। এখন আর ঘরে বসে থাকার সময় নাই...।

আমি একদমে কথাগুলো বললাম।

আবিদ বললো– তোর মাথার নাটবল্টু কি ঢিলা হয়ে গেল, শরীফ? কী-সব আবোল-তাবোল বকছিস...?

আমি আবিদের কথার কোনো গুরুত্ব দিলাম না। সুরের উৎস খুঁজতে লাগলাম– কোনদিক থেকে ভেসে আসছে এই দুর্দান্ত সুর। একবার উত্তরে কান পাতি, আবার দক্ষিণে; একবার পুবে কান পাতি তো, আবার কান পাতি পশ্চিমে। অবাক কাণ্ড! চারদিক থেকেই ভেসে আসছে এই সুর। অথচ দ্যাখো– আবিদের কানে এই সুর ঢুকছে না। নাকি আবিদ বধির? হতে পারে। আমরা হয়তো এতোদিন খেয়াল করিনি যে আমাদের বন্ধু আবিদ বধির। কিছুই কানে শোনে না...।

কাদের-শাহেদ এলো একটু পরে। আমরা চারজন সেনবাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম। আমি বা আবিদ, দু'জনের কেউই বাঁশির সুরের প্রসঙ্গ তুললাম না। যেন আমাদের দু'জনের মধ্যে এতোক্ষণ এই সুর শোনা বা না-শোনা নিয়ে কোনো কথাই হয়নি। আমরা সবাই চুপচাপ হাঁটছি। বুঝতে পারছি– কাদেরের মনটা বিষণ্ন। তারপরও ওর কাছে ওর মায়ের সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। তাতে হয়তো ওর মন আরো খারাপ হবে...।

আমরা হাঁটছি। কিছুদূর যেতে, হালটের দু'দিকেই খোলা চক। হাল-বাওয়া ক্ষেতে মাটির ঢেলায় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। আমাদের চোখ ধেঁধে যাওয়ার জো। চকটা দ্রুত পারি দিতে হবে। আমি বলতে যাবো, এই, তোরা সবাই জোরে পা চালা; শাহেদ তখনই দাঁড়িয়ে পড়লো, বললো– এই আবিদ-শরীফ, তোরা কিছু শুনছিস...?

আমি কিছু বললাম না। আমি জানি তো– শাহেদ এখন কী শোনার কথা বলবে। আবিদ বললো– কী শুনবো...?

বাঁশির সুর। কে যেন চমৎকার সুর তুলে বাঁশি বাজাচ্ছে...।

তুইও দেখি শরীফের মতো পাগল হয়ে গেলি, শাহেদ...! বললো আবিদ।

মানে? শরীফের মতো পাগল মানেটা কী...?

শরীফও একটু আগে তোর মতো বাঁশির সুর শুনেছে...।

তাই নাকি...?

সব পাগলের গুষ্ঠি...।

আমরা আবার হাঁটা শুরু করবো, তখনই হঠাৎ আমাদের সামনে বাউকুড়ানি উঠলো। দাদি বলে– বাউকুড়ানির ভেতরে ভূত-প্রেতের আড্ডা।

চৈত্র-বৈশাখের খড়তাপে ভূত-প্রেতেরা দাপাদাপি করে, আর তখনই বাউকুড়ানি ওঠে। বাউকুড়ানির সামনে পড়লে দৌড় দিতে নাই। দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে কলেমা পড়তে হয়– লাইলাহা ইল্লাললাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ। আমরাও কলেমা পড়ছি। বাউকুড়ানি সরে যাচ্ছে। কাদের হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো...।

কীরে, চিৎকার করছিস কেন? বাউকুড়ানি দেখে ভয় পেয়েছিস নাকি...?

না...।

তবে...?

আমিও শুনছি...।

কী শুনছিস...?

বাঁশির সুর...।

এবার আবিদ আর কিছু বললো না। চুপচাপ হাঁটছে। আমি বললাম– একটু পর আবিদও শুনবে...।

আমরা সেনবাড়ির পথে হাঁটছি। অন্যদিন আমরা বকবক করতে করতে হাঁটি। আজ চারজনের মুখেই কলুপ আঁটা। কারো মুখে রা-শব্দ নাই। অদৃশ্য বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরই আমাদের এলোমেলো করে দিয়েছে। কেউ কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না...।

শরীফ...। মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালো আবিদ।

কীরে, কিছু বলবি...?

আমিও বাঁশির সুর শুনছি...।

এখন আমরা চারজনেই বাঁশির সুর শুনছি। কী যে পাগল-করা সুর! বাঁশিওয়ালা যেন ধারেকাছেই কোথাও বসে সুর তুলছে...।

কিছুক্ষণ পর আমরা আবিষ্কার করি, চার বালক সেনবাড়ির পথ ছেড়ে নদীর পথে হাঁটছি। সামনে স্রোতস্বিনী লৌহজঙ। শুকনো মৌসুম। নদীর তলদেশে জলের কলকল শব্দ উঠছে...।

আমরা চার বালকই হতভম্ব। আমরা এখানে কেন? আমাদের গন্তব্য তো বসন্ত সেনের পোড়োবাড়ি...।

তখন আমার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়া 'হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা' গল্পের কথা মনে পড়লো। হ্যামিলন শহরের সব শিশু-কিশোর বাঁশির সুরের আকর্ষণে বাঁশিওয়ালার পেছনে পেছনে ছুটছিল। আমরাও কি তাই ছুটছি? আমাদের বাঁশিওয়ালা কই...?

দুই.

আমরা চার বন্ধু দাদুকে ঘিরে বসেছি। দুপুরবেলা। চৈত্র মাসের রোদ খা খা করছে, তাই বারবাড়ি জলপাইগাছের নিচে চাটাই পেতে বসেছি। দাদু আমাদের বঙ্গবন্ধুর গল্প শোনাচ্ছে...।

বৃটিশ আমলের মাইনর স্কুল পাশ দাদু। রাজনীতি করে। কংগ্রেস করেছে, মুসলিম লীগও করেছে। এখন আওয়ামী লীগ করে। তবে বয়সের কারণে এখন আর রাজনীতিতে অতোটা সক্রিয় না। তারপরও দেশ ও রাজনীতির সব খবরাখবর রাখে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলার পর দেশের রাজনীতি কোন পথে যাচ্ছে, পাকিস্তান ও ইয়াহিয়া খানের সামনে কী আছে, যুদ্ধ করেই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে হবে, নাকি কোনো বিকল্প এখনো আছে– এইসব নিয়ে গাঁয়ের অন্য মুরব্বিদের সাথে কথা বলে। বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা দাদুর মুখস্থ...।

এই যে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের 'খোকা'– শেখ মুজিবুর রহমান একদিন 'বঙ্গবন্ধু' হলেন, এখন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্তি দিতে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছেন, তিনি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, পুরো দেশের মানুষ তার পেছনে একাট্টা; এই লোকটি কি হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছেন, নাকি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন? তা তো হয়নি। তারও গাঁয়ের আর সব বালকের মতো শৈশব ছিল, কৈশোর ছিল; দুরন্ত এক বালকবেলা ছিল তার। ভয়-ডর বলে তার কিছু ছিল না। দিনটি কেমন যাবে– সকালের রূপ দেখেই যেমন তা অনুমান করা যায়, তেমনটি আর কেউ না-হোক, বঙ্গবন্ধুর বাবা শেখ লুৎফর রহমান অনুমান করতে পেরেছিলেন, তার ছেলে একদিন অনেক বড়ো হবে। তাই তো ছেলের কোনো কাজে কোনোদিন বাধা দিতেন না। শেখ মুজিবও পথের সব কাঁটা নিজের হাতে সরিয়ে, ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগুতে থাকেন। তিনিও যেন জানতেন, দেশের মানুষ ভালোবেসে তাকে একদিন 'বঙ্গবন্ধু' বলে ডাকবে, তার ডাকে একদিন কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা আগুনে ঝাঁপ দেয়ার মতো করে ঝাঁপিয়ে পড়বে মুক্তিযুদ্ধে; তিনি হবেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা...!

একদিন হয়েছে কী, শেখ মুজিবের বয়স তখন নয় কি দশ; ওই বয়সেই নদীতে সাঁতার কাটায় তার জুড়ি নাই, দুপুরবেলা গাঁয়ের ইয়ার-বন্ধুদের সাথে নিয়ে মধুমতি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুঙ্গিপাড়ার পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্তা মধুমতি। নদীতে যেমন স্রোত, তেমনি ঢেউ। বাতাস উঠলে নদীর গর্জন দূর থেকেও শোনা যায়। প্রচুর কুমিরের বাস নদীতে। নদীর কাছাড়ে উঠে বসে থাকে জোড়া-ধরা কুমির। মাঝে-মধ্যেই কুমিরের পেটেও যায় নদীঘেঁষা কোনো না কোনো গাঁয়ের মানুষ। অল্পবয়সী ছেলে কি মেয়ে, নদীতে নামলে ওরাই আক্রমণের শিকার হয় বেশি। কিন্তু বালক শেখ মুজিব কুমিরকে থোড়াই কেয়ার করে। দাদা-দাদি কিংবা মা-চাচি– কারো বাধাই সে মানে না। একটু ফুরসত পেলেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শেখ মুজিবের বাবা বাড়িতে থাকেন না, মাদারীপুর চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন। অবশ্য তিনি বাড়িতে থাকলেও ছেলেকে নদীতে নামতে বাধা দেন না। যাই হোক, সেদিন বন্ধুদের নিয়ে সে নদীতে নেমেছে, বন্ধুরা নদীর কাছাড়ের কাছেই 'নলডুব' খেলছে, শেখ মুজিব গভীর নদীতে সাঁতার কাটছে। হঠাৎ এক ছেলে চিৎকার করে উঠলো– 'মা গো, বাবা গো, কুমিরে ধরেছে, মরলাম গো...।'

শেখ মুজিব দ্রুত সাঁতার কেটে অকুস্থলে আসে। সেখানে পানি কম। কুমির ছেলেটির ডান পা কামড়ে ধরেছে। মুজিব এসেই, তার শরীরে যতো শক্তি আছে, সব শক্তি দুই হাতে জড়ো করে কুমিরের লেজ চেপে ধরলো। কুমিরের লেজে বড়ো বড়ো কাঁটা থাকে। বিষাক্ত কাঁটা। এই কাঁটার আঁচড় যেখানে লাগে, সেখানে পচন ধরে যায়। শেখ মুজিব এসবের তোয়াক্কা না করে কুমিরের লেজ ধরে টানতে টানতে ডাঙায় তুলে ফেললো...।

মনু মিয়ার নাতি আলালকে কুমিরে ধরেছিল, শেখ মুজিব তাকে বাঁচিয়েছে, কুমিরের লেজ ধরে টেনে ডাঙায় তুলেছে– এই খবর বাতাসের বেগে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ে নদীর পাড়ে। পানির কুমির ডাঙায় পড়ে তখন ভয়ে কাঁপছে। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। শেখ মুজিবের দাদা বুড়ো শেখ হামিদ নাতিকে কোলে তুলে নাচছে। ঘুরে ঘুরে বলছে– 'বাপের ব্যাটা শেখ মুজিব, শেখের ব্যাটা শেখ মুজিব...।'

দাদু শেখ মুজিব আর কুমিরের গল্প বলছে, ভয়ে আমার নিজের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে...।

কী বুঝলি ছোকরারা? যে ছেলে নয়-দশ বছর বয়সে কুমিরের সাথে লড়তে পারে, সে কি যে সে ছেলে? বঙ্গবন্ধুর যে সেই ছেলেবেলায়ই কী সাহস ছিল, আরো দু'টো গল্প বলি, শোন; তা হলেই বুঝবি। সাহস না থাকলে কি এতো বড়ো নেতা হওয়া যায়?

তোরা সবাই ক্লাস নাইনে পড়িস। শেখ মুজিব তখন এইটে পড়তো। তোদের চেয়ে একক্লাস নিচে। অবশ্য শেখ মুজিবের বয়স তোদের চেয়ে কিছু বেশি ছিল। সেভেনে ওঠার পর শেখ মুজিবের লেখাপড়ায় ছেদ ঘটে। তিনবছর লেখাপড়া করতে পারেনি। সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মারাত্মক অসুখ এটা। হার্ট তো দুর্বল হয়ই, পুরো শরীরও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবও খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। বাঁচারই কথা ছিল না। কিন্তু যে-ছেলে একদিন আমাদের 'বঙ্গবন্ধু' হবে, 'জাতির পিতা' হবে– সেই ছেলে কি তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে মরতে পারে? কী বলিস তোরা? না, মরতে পারে না। কোলকাতায় নিয়ে তার চিকিৎসা করা হয়। প্রায় দু'বছরের চিকিৎসায় শেখ মুজিব সুস্থ হয়ে ওঠে। ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য শেখ মুজিবের চিকিৎসক ছিলেন। খুব নামী ডাক্তার...।

এরপর বছর না ঘুরতেই শেখ মুজিব চোখের রোগে পড়ে। চোখে গ্লুকোমা হয়েছে। আবার কোলকাতা ছোটাছুটি। চিকিৎসার ভার নেন বিখ্যাত চোখের

ডাক্তার টি আহমেদ। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছিল না। সিদ্ধান্ত হয় অপারেশন করতে হবে। না-হলে দুই চোখই অন্ধ হয়ে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেখ মুজিবের চোখের অপারেশন করা হয়। গ্লুকোমা সেরে যায়। এই চোখের অসুখের কারণেও মুজিবের লেখাপড়া বছরখানেক বন্ধ ছিল...।

যাই হোক, শেখ মুজিব তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মুজিবের বাবা গোপালগঞ্জে বদলি হয়ে এসেছেন। শহরে বাড়ি করেছেন। বাপ-বেটার নিরিবিলি আবাসস্থল। শেখ মুজিবের মা সায়েরা খাতুন গ্রামের বাড়িতে থাকেন। টুঙ্গিপাড়া। তিনি শেখবাড়ি সামলান। গোপালগঞ্জে এলে একরাত কি দু'রাত, তারপরই টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার জন্য হা-হুতাশ করেন। শহরের বাড়ি তার কাছে মুরগির খোয়ারের মতো লাগে। দমবন্ধ হয়ে আসে...।

তখন একদিন শহরে শোরগোল পড়ে গেলো। বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে আসবেন। বিশাল সভা হবে। একজিবিশন হবে। চারদিকে সাজসাজ রব। নেতাদের নাওয়া-খাওয়া নাই। আয়োজনে-আপ্যায়নে কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। শেখ মুজিব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা। তারও দম ফেলার ফুরসত নাই...।

হক সাহেব বুড়ো মানুষ। সভা শেষে সরকারি ডাকবাংলোয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। শহীদ সাহেব মিশন স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন। তাঁকে স্কুলে সংবর্ধনা দেয়া হলো। তিনি শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কীভাবে দেশ ও জাতির উন্নতি হবে, কীভাবে লেখাপড়া করলে স্কুলের ফলাফল ভালো হবে; এইসব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখলেন। তারপর যেই না লঞ্চঘাটের উদ্দেশ্যে পথে নেমেছেন, এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে বসলো বালক শেখ মুজিব। সে শুয়ে পড়েছে পথের ওপর। পথ বন্ধ। তার কাণ্ড দেখে স্কুলের শিক্ষকদের কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে। তারা জানে– শেখ মুজিব বেয়ারা ছেলে, কখন কী ঘটিয়ে বসে ঠিক নাই; তাই বলে মন্ত্রীর পথ আটকাবে! এখন তার কারণে বুঝি চাকরিটাই খোয়াতে হয়...।

শহীদ সাহেবের সাথে সান্ত্রী-সেপাই ছিল। তারাও কাঁপছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না...।

তখন, শহীদ সাহেব বললেন– 'এই ছেলে, তুমি কে? এভাবে পথ আটকিয়ে শুয়ে পড়লে যে...।'

শেখ মুজিবের তো ভয়-ডরের বালাই নাই। সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো। বললো– 'স্যার, আমার নাম শেখ মুজিব...।'

পথ আটকালে কেন? পুলিশ তো তোমাকে মন্ত্রীর পথ আটকানোর দায়ে গ্রেফতার করতে পারে...।

তা জানি। করলে করুক। কিন্তু আমি পথ ছাড়বো না। আগে আমার কথা শুনতে হবে...।

বলো, কী কথা তোমার...?

স্যার, আমাদের স্কুলের চাল ভাঙা। বৃষ্টি হলে পানি পড়ে। নতুন চাল করে দিতে হবে...।

মুজিবের কথা শুনে শহীদ সাহেব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন– সাবাশ শেখ মুজিব! তোমার মতো ছেলেরই এখন দেশের জরুরি দরকার। কোলকাতা গেলে তুমি অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর অচিরেই তোমাদের স্কুল ঘরের নতুন চাল হয়ে যাবে...।

যাদের পা কাঁপছিল, তাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না– শহীদ সাহেব শেখ মুজিবকে জড়িয়ে ধরবেন। পিঠ চাপড়ে বাহবা দেবেন। মন্ত্রীর আচরণ দেখে তাদের পা কাঁপা বন্ধ হয়ে গেলো...।

আমরা দাদুর মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। দাদু মিটিমিটি হেসে বললো– কী ছোকরারা, আরো শুনবে...?

শুনবো, দাদু..।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের এই ২৪ বছরে ১২ বছর জেল খেটেছেন। এ রকমও হয়েছে– কিছুদিন পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুচ্ছেন, কেবলই জেলগেট পার হয়ে বাইরে পা রেখেছেন, আবার গ্রেফতার। ডিবি'র লোক ওঁৎপেতেই থাকে। কখনো কখনো একনাগারে দুই-তিনবছরও জেলে থাকতে হয়েছে। একবার হয়েছে কি, বঙ্গবন্ধু প্রায় তিনবছর জেল খেটে ছাড়া পেয়েছেন। দীর্ঘদিন জেলে থাকায় শরীরটাও ভেঙে পড়েছে। ক'দিনের জন্য বাড়িতে এসেছেন। তখন বঙ্গবন্ধুর বড়ো সন্তান শেখ হাসিনার বয়স ছয় কি সাত, ছোট সন্তান শেখ কামালের বয়স তিন বছর। হাসিনা সুযোগ পেলেই বঙ্গবন্ধুর কোলে চড়ে। কিন্তু কামাল বঙ্গবন্ধুর কাছে আসে না। সে মনে মনে বলে– হাসু আপা কেন অচেনা এই লোকটির কোলে চড়ে...!

তাহলে ঘটনা কী...?

ঘটনা এরকম– কামালের বয়স যখন মাত্র দুই মাস, বঙ্গবন্ধু তখন গ্রেফতার হন। তিনবছর পর মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসেছেন। স্বাভাবিক কারণেই কামাল বঙ্গবন্ধুকে বাবা হিসেবে চিনে না। তার মনে লোকটি অপরিচিত কেউ...।

তখনই একদিন মর্মান্তিক এক ঘটনা ঘটলো...।

বঙ্গবন্ধু ঘরের বিছানায় বসে রেনু ভাবীর সাথে গল্প করছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর নাম রেনু। সকাল ১১টার মতো বাজে তখন। ঘরের জানালা-দরোজা সব খোলা। হাওয়া খেলছে ঘরের ভেতর। হাসিনা-কামাল দু'জনে নিচে বসে 'বাঘ-ছাগল' খেলছে। খেলা ফেলে হাসিনা মাঝে-মাঝেই বঙ্গবন্ধুর কোলে চড়ে। আব্বা, আব্বা ডাকে। এটাও যেন হাসিনার একটা খেলা। কামাল চেয়ে থাকে। হঠাৎ কামাল করলো কি, বললো– 'হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি...।'

কামালের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কেঁদে ফেললেন। ঝরঝর করে পানি পড়ছে তার চোখের কোণ বেয়ে। কামালকে কোলে তুলে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন– 'আমি তো তোমারও আব্বা, কামাল...।'

রেনু ভাবীর চোখেও তখন টলমল করছে পানি...।

তো, এই যে বঙ্গবন্ধুর জেলখাটা, এটাও কিন্তু শুরু হয়েছে সেই ক্লাস এইট

থেকেই...।
বলো কী, দাদু...!
হ্যাঁ। ওই যে হক সাহেব আর শহীদ সাহেব গোপালগঞ্জ এসেছিলেন, তার কিছুদিন পরের ঘটনা। তখন দেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ছিল। এই বদ-হাওয়া গোপালগঞ্জেও লেগেছিল কিছুটা। কোনো কিছু নিয়ে সামান্য বিরোধ হলেই হিন্দুরা জোট বেঁধে মুসলমানদের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করতো...।
বলেছি তো আগে, শেখ মুজিব ছোটবেলা থেকেই দুর্দান্ত সাহসী ছিল। কোনো অন্যায়-অনাচার সে সহ্য করতো না। একদিন সন্ধ্যার আগে আগে মুজিব ফুটবল খেলে বাড়ি ফিরছে। বাড়ির পথে শহরের মানী-লোক খন্দকার শামসুল হক সাহেবের সাথে দেখা। শামসুল হক শেখ মুজিবকে থামিয়ে বললেন, 'বাবা মজিবর, মালেককে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে মারপিট করছে। যদি পারো একবার যাও...।'
আব্দুল মালেক শামসুল হক সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শেখ মুজিবের সহপাঠী। বন্ধু। তাকে ধরে নিয়ে মারপিট করেছে– এ খবর শুনেই মুজিবের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন ছাত্রবন্ধুকে সাথে নিয়ে সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে গেলো শেখ মুজিব। মালেককে বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সুরেন ব্যানার্জি উঠোনে চেয়ারে বসে আছে। হিন্দু মহাসভার লোকজনও আছে কিছু। শেখ মুজিব তার দলবল নিয়ে সেখানে হাজির। সে হুঙ্কার ছাড়লো– 'বাবুমশাই, মালেককে কেন ধরে এনেছেন? ওকে এক্ষুনি ছেড়ে দিন। নইলে কেড়ে নেবো...।'
রমাপদ দত্ত নামে মহাসভার এক পাকা বাঁশের লাঠি হাতে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। শেখ মুজিবের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, রমাপদ মুজিবের মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে বাড়ি মারলো। বাড়ি মুজিবের মাথায় লাগলো না। মুজিব ব্রতচারী-করা ছেলে। ব্রতচারী কী জিনিস তোরা এখন বুঝবি না। বড়ো হলে বুঝবি। সে রমাপদর লাঠির বাড়ি তার মাথায় লাগার আগেই লাঠি ধরে ফেললো। লাঠি কেড়ে নিলো রমাপদর হাত থেকে। তারপর ওই লাঠি দিয়েই আঘাত করলো রমাপদ দত্তর মাথায়...।
তখন দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি বেঁধে গেছে। লাঠালাঠি চলছে। দু'পক্ষের কয়েকজনের মাথাও ফেটে গেছে। রমাপদ দত্তের মাথাটাই ফেটেছে বেশি। শেখ মুজিবের লাঠির বাড়ি লেগেছিল তার মাথায়। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে পুলিশ চলে এসেছে। পুলিশ আসতে না-আসতেই মুজিব-বাহিনী মালেকের শরীরের বাঁধন খুলে তাকে নিয়ে কেটে পড়ে...।
এই নিয়ে রাতে শহরে তুমুল উত্তেজনা। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেঁধে যায় আর কি। যাই হোক, দাঙ্গা না-বাঁধলেও শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো– রমাপদ দত্ত বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছে। খন্দকার শামসুল হক হুকুমের আসামী। শেখ মুজিব নাকি রমাপদ দত্তকে খুন করতে গেছিল। তার মাথা খণ্ড হয়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাঁচে কি মরে ঠিক নাই। শহরের গণ্যমান্য সব মুসলমানের ছেলেকেই মামলার আসামী করা হয়েছে...।
পরদিন সকাল ন'টার মধ্যে খবর এলো– শেখ মুজিবের মামা শেখ সিরাজুল হকসহ ১০-১২ জনকে রাতেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। মুজিবদের বাড়িতে রাতে হানা দেয়নি। শেখ লুৎফর রহমান সাহেব গোপালগঞ্জ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন। তার ছেলেকে গ্রেফতার করতে রাতে অভিযান চালানো সঠিক হবে কি হবে না, পুলিশ এই নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। তাছাড়া শেখ মুজিবের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে সবারই জানা। পুলিশও জানে, সে কোথাও পালাবে না...।
শেখ মুজিব রাতে বাড়িতেই ছিল। শেখ লুৎফর সাহেব বাড়িতে ছিলেন না। ঘটনা যেদিন ঘটে, সেদিন ছিল রবিবার। অফিস-আদালত সব বন্ধ। শেখ লুৎফর সাহেব শনিবার বিকেলে অফিস শেষে টুঙ্গিপাড়া যান। গ্রামের বাড়িতে। সোমবার সকালে গোপালগঞ্জে ফিরে অফিস করেন। সেদিন, সোমবার সকালে, শেখ লুৎফর সাহেব তখনো টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরেননি, গোপালগঞ্জের বাড়িতে শেখ মুজিবের এক ফুফাতো ভাই, বাড়ি মাদারীপুর, সে মুজিবদের বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করে, মুজিবের চে' বয়সে কিছুটা ছোট, সে বললো– 'মিয়াভাই, টাউন হলের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো এখনই বাড়িতে আসবে; তুমি পাশের বাড়িতে একটু সরে যাও না...।'
ছেলেটিকে ধমক দিল শেখ মুজিব। 'ভয় পেলে তুই পালা। আমি পালাবো না। পালালে লোকে বলবে– শেখ মুজিব ভয় পেয়েছে। মনে রাখিস, শেখ মুজিব কাউকে ভয় পায় না...।'
কিছুক্ষণ পর শেখ লুৎফর সাহেব বাড়িতে এলেন। পুলিশের দারোগা লক্ষ রাখছিল শেখ লুৎফর রহমান কখন বাড়িতে আসেন। তিনি বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগা কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। লুৎফর সাহেবকে বললো– 'স্যার, মজিবরের নামে ওয়ারেন্ট আছে। মারামারির মামলা...।'
শেখ লুৎফর রহমান ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন– 'মারামারি করেছো...?'
শেখ মুজিব নিরুত্তর। তার মানে ঘটনা ঠিক। মারামারি করেছে...।
লুৎফর রহমান বললেন, 'নিয়ে যান...।'
দারোগা বললো– 'একজন সিপাই রেখে যাই। ও খেয়ে-দেয়ে সিপাইর সঙ্গে আসুক...।'
শেখ মুজিব থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করলো। রাতে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের সঙ্গে মুজিবকেও কোর্টে পাঠানো হলো...।
কোর্ট দারোগার কক্ষের পাশেই কোর্ট হাজত। সবাইকে সেখানে রাখা হয়েছে। আদালত তখনো বসেনি। কোর্ট ইন্সপেক্টর শেখ মুজিবকে দেখেই বললো– 'মজিবর ড্যাঞ্জারাস ছেলে। রমাপদকে ছোরা মেরেছে। খুন করতে চেয়েছিল। কোন মতেই ওকে জামিন দেয়া যাবে না...।'
শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট ইন্সপেক্টরের কথার প্রতিবাদ করলো। 'বাজে কথা বলবেন না। ভালো হবে না। রমাপদকে আমি ছোরা মারিনি। রমাপদই প্রথমে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেছিল। আমি ওর লাঠি কেড়ে নিয়ে প্রত্যাঘাত করেছি...।'
আদালত খন্দকার শামসুল হক সাহেবকে টাউন-জামিন দিলেন। শেখ মুজিবসহ বাকি আর কারো জামিন হলো না...।
দুপুর গড়িয়ে গেছে। জলপাই গাছের ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলার গল্প শুনছি। দাদু গড়গড়ায় দু'টো টান দিল। তারপর বললো– 'আইজ থাক। কাইল আবার শোনাবো। গরুর দড়ি ছিঁড়া গেছে। দড়ি পাকান লাগবো...।'
দাদু ওঠার আগেই দাদি কোত্থেকে যেন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। দাদুকে বললো– 'এই যে, তুমি কি কিছু শুনতেছো?'
দাদু বললো– 'কী শুনমু...।'
বাঁশির সুর। ক্যারা যানি খুব সুন্দর সুর তুইলা বাঁশি বাজাইতেছে...।
কও কী? কোনে...?
এইডাই তো অইছে মুশকিল। একবার শুনি পুব দিকে। আবার শুনি পশ্চিম দিকে...।
তোমারে কি ভূতে ধরছে নাকি? কী সব আবোল-তাবোল কইতেছ...।
দাদুর কথা শেষ হতে না হতেই মা ছুটে এলো। 'বাঁশির সুর? হ বাজান। আমিও শুনতেছি...।'
একটু দম ধরলো দাদু। তারপর বললো– 'তাই তো রে। আমিও তো শুনতেছি...।'

পাদটীকা :
রসুলপুরের ছেলে-বুড়ো সবাই এখন এই বাঁশির সুর শোনে। গালা, সদুলাপুর, পৌলি, শালিনা, খলদবাড়ির লোকেরাও শোনে। শোনে দেশের সব গাঁয়ের মানুষ। তীব্র আকর্ষক এই সুর। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার সুরের চেয়েও সুতীব্র। দাদু বলেছে– এই বাঁশিওয়ালা আর কেউ না, বঙ্গবন্ধু নিজে। রেসকোর্স ময়দানে তিনি বাঁশি বাজিয়েছেন। তাঁর বাঁশির সেই সুর ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র...।
আমরা চার বালক, যেদিক থেকেই এই মোহন সুর ভেসে আসে, সেদিকেই ছুটে যাই। কোথাও যদি বাঁশিওয়ালার দেখা মেলে...! ■

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল গত ৭ অক্টোবর বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে এর পরিচালকবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, অর্থ পরিচালক মোশাররফ হোসেন, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রাণেশ বণিক, অতিরিক্ত পরিচালক- কর্মসূচি ফারমিনা হোসেন এবং অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রধান আব্দুল হালিম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল আওয়াল।

ওয়াটার ক্রেডিট কর্মসূচির প্রশিক্ষণ

গত ১৯-২৩ জুলাই দাতা সংস্থা Water.org এর সহযোগিতায় "নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক মুখ্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ" শীর্ষক ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি, জলবায়ু পরিবর্তন, জিওফ্যাজি, হাইজিন, যোগাযোগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে মুখ্য প্রশিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। প্রশিক্ষণে বুরো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ বিভাগের ১৭ জন প্রশিক্ষক এবং ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের ১১ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। ৫ দিন ব্যাপী প্রাণবন্ত এ প্রশিক্ষণে অনলাইনে যুক্ত হয়ে কথা বলেন, বুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, পরিচালক বিশেষ কর্মসূচী সিরাজুল ইসলাম, দাতা সংস্থা Water.org এর প্রতিনিধি মো. আবু আসলাম এবং সহকারী সমন্বয়কারী-বিশেষ কর্মসূচি এসএমএ রকিব। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণ-নজরুল ইসলাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ময়মনসিংহ-ইসতিয়াক আহমেদ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মধুপুর-জহিরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ওয়াটার ক্রেডিট প্রকল্পের ব্যবস্থাপক এসজেডএম শাহরিয়ার ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান। এই প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতায় বুরো বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, মধুপুর, বারিধারা, কুমিল্লা, খুলনা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম এবং সিলেট মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে গত ১৬ আগস্ট থেকে একযোগে ৬টি ব্যাচে প্রায় ৭০০ জন এসপিও এবং পিওকে Basic WASH প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শোক দিবসে বৃক্ষরোপণ অভিযান

বুরো বাংলাদেশ যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উদযাপন করেছে। করোনাভাইরাসের কারণে এ বছর সিমীত পরিসরে কিন্তু ভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৫ আগস্ট শনিবার সংস্থার গুলশানস্থ প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখাসহ দেশের প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে শোক দিবসের ব্যানার প্রদর্শন করা হয়। একসাথে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জাতীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশ সারা দেশে তিনটি করে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি শাখা নিকটস্থ স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও উপজেলা সদরে একটি করে ফলদ, বনজ ও ওষুধি বৃক্ষের চারা রোপন করেছে।

১৫ আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস
উদার হিমালয় তুমি, সমুদ্রের অফুরান গান
ভুলিনি তোমাকে আমরা শেখ মুজিবুর রহমান
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকীতে
বুরো বাংলাদেশ-এর
শ্রদ্ধাঞ্জলি
BURO Bangladesh
যশোর অঞ্চল

NORWAY

সিলেটে বুরো বাংলাদেশের CHRD

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের ইচ্ছা কার না মনে জাগে? যে কোনো মানুষের মধ্যেই কখনো একা, কখনো পরিজনসহ আবার কখনো দল বেঁধেও বেড়াতে মন চায়, উপভোগ করতে ইচ্ছে করে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মাতোয়ারা রূপ। কিন্তু কোথাও বেড়াতে যাবার আগে প্রথমেই প্রশ্ন দেখা দেয় কোথায় মিলবে নিরাপদ আশ্রয়, মিলবে নিরাপদ খাবার? এসব ভেবে অনেকেই ইচ্ছা সত্ত্বেও বেড়াতে যান না। না আর চিন্তা নেই, বুরো বাংলাদেশ-এর CHRD এ জন্য প্রস্তুত।

সিলেট একদিকে যেমন ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি পুণ্যময় স্থান, তেমনি দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা হিসেবে এর সুনাম বিশ্বব্যাপী। এখানে রয়েছে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের চা বাগান, জাফলং, তামাবিল, হাকালুকি-টাঙ্গুয়ার হাওড়, লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্ট প্রভৃতি।

দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের পর্যটকদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত 'মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোকে সাজিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা– যেমন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্সের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই কেন্দ্রগুলোতে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ বেড়াতে গিয়েও নিরাপদ আবাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন এখানে। স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনায় চাহিদামতো খাবারও পরিবেশন করা হয় এই সিএইচআরডিগুলোতে।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ির চা বাগানের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে ভরপুর সিলেটের খাদিমপাড়া আবাসিক এলাকায় স্থাপিত বুরো বাংলাদেশ-এর সিএইচআরডিতে রয়েছে নিরাপদ আবাসন। পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা যেমন মনোরম পরিবেশ ও উন্নতমানের স্যুইট, এসি/নন-এসি, সিঙ্গেল/ডাবল আবাসিক রুম, এসি ডাইনিং রুম, রয়েছে এসি মাল্টিমিডিয়া কনফারেন্স রুম। সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওয়াইফাই, রুম সার্ভিস, ব্যায়ামাগার, গাড়ি পার্কিংসহ নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আচ্ছাদিত এই ভবনটি আধুনিকতায় ভরপুর। সিলেট এলে বুরো বাংলাদেশ এর সেবা গ্রহণের মাধ্যমে যে কোনো পর্যটকই করতে পারেন নিরাপদ ভ্রমণ।

সিলেট সিএইচআরডিতে ১টি উন্নতমানের হল রুম, ২টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ১টি ডাইনিং রুম, এসি কাপল ৪টি রুম, ২ বেডের ৩টি এসি রুম, ২ বেডের ৪টি এসি রুম এবং ৩ বেডের ৮টি নন এসি রুম রয়েছে। মোট ১৯টি কক্ষে ৪৬ জনের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

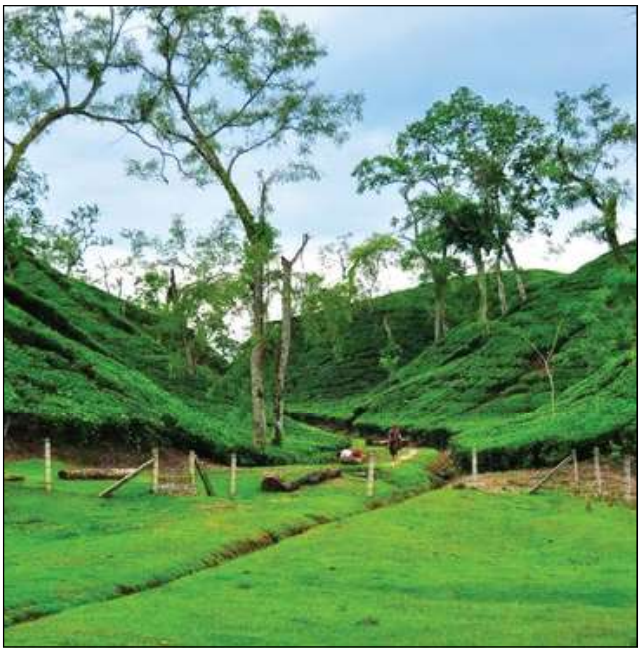

বাড়ী-৩২, সড়ক-১, খাদিমপাড়া
(আবাসিক এলাকা), সিলেট
মোবাইল: ০১৭০১২৫০১১৫
ই-মেইল: chrd_sylhet@burobd.org

দুই হাজার দশ-এ শুরু করেছিলেন একটি দিয়ে। এখন বাড়িতে তার এগারোটি গাভীর খামার। সবগুলোই বিদেশী জাতের। প্রতিদিন বিক্রি করেন গড়ে ৪০ কেজি দুধ। বিক্রি করেন বাছুরও; একেকটি প্রায় ষাট হাজারে। দুই সন্তান প্রাথমিকে পড়ে; স্বামী আলমগীর হোসেন ৪২ শতাংশ জমি কিনেছেন পুকুর কেটে মাছ চাষ করবেন বলে। সচ্ছল, সুখী ও হাস্যজ্জল এক উদ্যোক্তা বেগম শামীম আরা। দশ বছর আগে পাবনার মুলাডুলিতে স্বামীর সংসারে আসার পর জীবন বদলাতে পাশে পেয়েছিলেন বুরো বাংলাদেশকে। বুরো বাংলাদেশ এখনও তার পাশে আছে। অদম্য শামীম আরা'র এই হাসি একদিন হয়ে উঠবে পুরো বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ • সংখ্যা-২২ • বর্ষ-৬